গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৫ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১২ - ১৮ এপ্রিল, ২০১৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

দেশের ভালো-মন্দ নিয়ে ছাত্ররা ভাববে না ?

বামপন্থী ছাত্রকর্মী সুদীপ্ত গুপ্তর পুলিশ হেফাজতে মর্মান্তিক মৃত্যুর পর এর প্রকৃত কারণ জানতে যথাযথ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠেছে। কিন্তু এই মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয় বলতে বলতে বৃহৎ সংবাদমাধ্যমগুলি যে ভাবে ছাত্র রাজনীতি সহ সমস্ত প্রতিবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধেই বিষোদগার করে চলেছে তার পিছনেও কাজ করছে এক ধরনের কূট রাজনৈতিক অভিসন্ধি। এমনকী

আইন অমান্য আন্দোলনকে পর্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে। বাংলার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকটি লিখেছে আইন অমান্য করতে গেলে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা নাকি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর।

এদেশে আইন অমান্য আন্দোলন স্বাধীনতার পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্যবার হয়েছে। স্বাধীনতার আগে দেশনেতারা প্রায় সকলেই আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। উত্তেজনা কিছু কম সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের ধ্বজাধারীরা ছাড়া আর কারও অমঙ্গলের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে বলে তো জানা নেই! স্বাধীনতার পরেও কংগ্রেস আমলে বা সিপিএম আমলে এই রাজ্যে অসংখ্য আইন অমান্য আন্দোলন তো হয়েছেই, এমনকী অনেকেরই নিশ্চয়ই মনে আছে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা পুনঃপ্রবর্তনের মতো শিক্ষাগত দাবিতেও আইন অমান্য হয়েছে এবং তাতে সামিল হয়েছিলেন ডঃ সুকুমার সেন, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নীহার রঞ্জন রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলেশ দে প্রমুখ দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সাহিত্যিকরা। আইন অমান্যে পুলিশের আক্রমণে মানুষের রক্ত ঝরেছে বহুবার। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কিশোর কর্মী মাধাই হালদারের প্রাণ গেছে পুলিশের গুলিতে। অসংখ্য মানুষের দেহে পুলিশের লাঠির আঘাত নেমে এসেছে। কিন্তু এজন্য দায়ী তো পুলিশ এবং সরকার। তার জন্য আন্দোলন বন্ধ করতে হবে কেন? যদিও পুলিশকে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ এবং সংযত হওয়ার জন্য সংবাদমাধ্যমের কোনও পরামর্শ দেখা গেল না!

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনে রাওলাট আইন এনে চেষ্টা করা হয়েছিল ছাত্র আন্দোলনের রাশ টেনে ধরার। ব্রিটিশের কিছু ধামাধরারাও সেই প্রচেষ্টায় তাল মিলিয়েছিল। এর বিরোধিতায় সরব হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো দেশপ্রেমিকরা। অথচ আজও শাসকের তখতে যারাই বসছে তারাই ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়ে চলেছে। বুর্জোয়া

দু'য়ের পাতায় দেখুন

ভিতরের পাতায়

- কমিউনিস্ট ইশতেহার রচনার পথে মার্কস-এঙ্গেলস
- উত্তর কোরিয়ায় মার্কিন প্ররোচনা

পুনরায় টেট পরীক্ষার দাবিতে মেদিনীপুরে বিক্ষোভ

পুলিশের লাঠিতে ছাত্রনেতা রক্তাক্ত

২ এপ্রিল। মেদিনীপুর।

সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় মেদিনীপুর শহরে ছাত্র যুবদের এক মিছিলে বর্বরোচিত লাঠিচার্জ করল তৃণমূল সরকারের পুলিশ। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় চূড়ান্ত সরকারি নৈরাজ্যের কারণে যারা পরীক্ষা দিতে পারেনি তাদের অবিলম্বে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার দাবিতে ছাত্র সংগঠন ডি এস ও এবং যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও ২ এপ্রিল মেদিনীপুরে জেলাশাসক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ অফিসে ডেপুটেশনের আয়োজন করেছিল। শান্তিপূর্ণ মিছিল সংসদ অফিসে পৌঁছানোর সাথে সাথে কোতোয়ালি থানার আই সি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ও র‍্যাফ বিনা প্ররোচনায় বেপরোয়া লাঠি চালাতে শুরু করে। টেনে হিঁচড়ে আন্দোলনকারীদের পুলিশ ভ্যানে তোলা হয়। চার জন ছাত্রী সহ ১৭ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ডি এস ও জেলা সম্পাদক কমরেড ভীম মণ্ডল, জেলা সভানেত্রী কমরেড নমিতা পাল, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কুমারেশ দে, কমরেড দীপক পাত্র সহ ১৭ জনের নামে পুলিশ ৬টি ধারায় মিথ্যা মামলা দায়ের করে। গুরুতর আহত দীপক পাত্রকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হয়। পুলিশ আন্দোলনকারীদের সঙ্গে থানাতেও চূড়ান্ত অশালীন আচরণ করে। লাঠির গুঁতো দিতে দিতে লকআপে ঢোকায় এবং অশ্রাব্য গালি-গালাজ

আটের পাতায় দেখুন

লক আউটে শ্রম দিবস নষ্ট হয়েছে ৫৬ হাজার ধর্মঘটে হয়েছে মাত্র ৯,৫৯২টি

"ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্মহীন দিনগুলি দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে— তাদের অবিশ্রাম ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে...।"

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু এমন একটি তথ্য দিয়েছেন যা শুনে বহু মানুষই চমকে উঠবেন। এক প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে গত এক বছরে শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছে ৫৫,৮৬,১৭০টি। এর মধ্যে মালিকরা কারখানায় লক আউট ঘোষণা করায় নষ্ট হয়েছে ৫৫,৭৬,৫৭৪টি। বিপরীতে শ্রমিকরা ধর্মঘট করায় নষ্ট হয়েছে মাত্র ৯,৫৯২টি। অর্থাৎ ধর্মঘটে একটি শ্রমদিবস নষ্ট হলে লকআউটে হয়েছে তার ৫৮১ গুণ। মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, ২০১১ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত লক আউট হয়েছে ৩৯টি শিল্পসংস্থায়। অন্য দিকে ধর্মঘট হয়েছে মাত্র ২টি শিল্পসংস্থায়।

সব সময়ই দেখা যায়, কলে-কারখানায় মালিকদের তীব্র শোষণ বা অন্যায় জুলুমের বিরুদ্ধে ধর্মঘট হলে বা সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে রাজ্যে অথবা দেশজুড়ে বনধ বা সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হলে কত আর্থিক ক্ষতি হয় তা নিয়ে কারখানা মালিক, খবরের কাগজ, রেডিও টিভি, মন্ত্রীদের আক্ষেপের শেষ থাকে না। তারা প্রচার করে, শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণেই কারখানা বন্ধ হয়। এমন ভাব দেখায় যেন হাজার হাজার কারখানা যে বন্ধ হয়ে রয়েছে তার জন্য শ্রমিকরাই দায়ী। মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য দেখিয়ে দিল, মালিকদের এই প্রচার কত বড় মিথ্যা।

সাতের পাতায় দেখুন

২৪ এপ্রিল

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রতিষ্ঠা দিবসে

সমাবেশ

রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ

বিকাল ঃ ৪-৩০

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার

ছাত্ররা ভাববে না?

একের পাতার পর

সংবাদমাধ্যমও তার শরিক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথার্থ শিক্ষা হোক এ কথা সকলেই বলবেন। কিন্তু সরকার যখন একের পর এক শিক্ষাবিরোধী পদক্ষেপ নেয়, পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার মতো সর্বনাশা সিদ্ধান্ত নেয় তার প্রতিবাদ করা শিক্ষার স্বার্থেই প্রয়োজন। আধুনিক, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ ছাত্র সংসদে ছাত্রদের অংশগ্রহণ। দেশের এবং বিশ্বের চলমান রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ থেকে মুখ ঘুরিয়ে থেকে তা সম্ভব কি? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু শিক্ষকতা করাকালীন সুভাষচন্দ্র বসু ছাত্র আন্দোলন করেছেন। এর জন্য এই মহান শিক্ষকরা কোনও দিন শিক্ষা বিপন্ন হচ্ছে এ কথা বলেননি। একটা কথা সুকৌশলে বলা হচ্ছে যে, রাজনীতির কারবারিরা ছাত্রদের আকোকে কাজে লাগিয়ে তাদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়। তার জন্যই নাকি ছাত্রদের রাজনীতি থেকে দূরে থাকা উচিত। বৃহৎ সংবাদপত্রের পাতায় ক্ষুদিরামকে জড়িয়েও এই ধরনের কুরুচিকর কথা লেখা হয়েছে। দেশের কোনও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে কি এগুলি মানা সম্ভব? এ কথা ঠিক রাজনীতির মধ্যেও ঠিক-বেঠিকের প্রশ্ন আছে। শাসক-শোষিতের রাজনীতির পার্থক্য আছে। জীবন সম্পর্কে কোন দৃষ্টিভঙ্গি সংশ্লিষ্ট রাজনীতি উপস্থিত করছে তার স্বরূপ চিনতে পারা দরকার। ছাত্রজীবনই হল সত্যকে গ্রহণ করার উপযুক্ত সময়। এই সময়ে তারা কি সমাজের ভালোমন্দ থেকে মুখ ঘুরিয়ে, জীবন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে শুধু কেরিয়ারের গ্রাফটা ঊর্ধ্বমুখি করে রাখা প্রচেষ্টায় মগ্ন থাকবে! এ চিন্তা সমাজের মঙ্গল করতে পারে কি? ছাত্রদের সত্যানুসন্ধানের রাজনীতি করার প্রয়োজনকে তুলে ধরে মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বলেছিলেন— "সত্য সংবাদ পেলে পাছে তোমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়,...এই আশঙ্কায় মিথ্যে দিয়েও তোমাদের দৃষ্টি রোধ করা হয়, এ খবর তোমরা হয়ত জানতেও পার না।... ইস্কুল কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার...এবং এই অধিকারের কথাটা মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করবার অধিকার আছে।"

কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি সহ সমস্ত বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি ছাত্র রাজনীতিকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ দখল করার সমার্থক করে তুলেছে। গায়ের জোরে সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে, ছাত্রদের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে, তারাই আবার ছাত্র সংসদ নির্বাচনে গায়ের জোর বন্ধ করার কথা বলে লিংডো কমিশনের সুপারিশ নিয়ে হইচই করছে। লিংডো কমিশন নিয়োগ করেছিল প্রথম ইউ পি এ সরকার, যার অন্যতম শরিক ছিল সিপিএম। এই কমিশন সুপারিশ করেছে ছাত্র সংসদে প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে গেলে অনার্সের ছাত্র হতে হবে, কমপক্ষে পঁচাত্তর শতাংশ হাজিরা থাকতে হবে, কোনও মিটিং-মিছিল করা চলবে না, পোস্টার চলবে না ইত্যাদি। এই প্রচারে প্রভাবিত হয়ে অনেকেই মনে করেন এর মধ্য দিয়েই বোধহয় ছাত্র সংসদের নামে যে মস্তানি, মাতব্বরি চলে তা বন্ধ হবে। কিন্তু তাঁরা খেয়াল করেন না, যে দলগুলি এই লিংডো কমিশনের সুপারিশ নিয়ে গলা ফাটায়, তারা নিজের দলের মধ্যে মস্তান পোষা বন্ধ করেনি। এই দলগুলি ছাত্র রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামায় ইউনিয়নের হাতে থাকা বিপুল তহবিলের মধুভাণ্ড দখলের জন্য। এজন্য বোমা বন্দুক, লাঠি নিয়ে নামতে তারা কোনও মতেই কুণ্ঠিত নয়। ছাত্র রাজনীতি নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। বরং ছাত্রদের যথার্থ রাজনীতি সচেতনতাকে তারা ভয় পায়। ছাত্ররা রাজনীতি বিমুখ হয়ে থাকলে একদিকে যেমন শাসক শ্রেণির সুবিধা, অন্যদিকে তাদের স্বার্থরক্ষাকারী এই দলগুলিরও সুবিধা। না হলে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার চক্রান্তের পথ সুগম হবে কী করে? সারা দেশেই তাই যে যেখানে ক্ষমতায় আছে তারাই ছাত্রসংসদগুলি অবাধে দখল করার জন্য পেশিবল প্রয়োগ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে একসময় কংগ্রেসের ছাত্রসংগঠন ছাত্র পরিষদ এই সন্ত্রাসের মূল হোতা ছিল। তারপর তা আরও বিস্তৃত করেছিল এস এফ আই। এখন তৃণমূল সেই ধারাবাহিকতাতেই চলছে। কিন্তু এদের দুষ্ট রাজনীতির অজুহাতে ছাত্রদের উপর সামগ্রিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ চাপানোর অর্থ হচ্ছে এর বিরুদ্ধে যতটুকু প্রতিবাদ হতে পারত তাও বন্ধ করে দেওয়া। যে ছাত্ররা দিল্লির রাস্তায় প্রতিবাদে নেমেছিল তাদের ক্লাসে হাজিরা কত সে প্রশ্ন যারা তুলতে চায় তারা আসলে কী চায়! যে সংবাদপত্র ছাত্রদের রাজনীতি নিয়ে এত উদ্বিগ্ন তারা টিন এজারদের জন্য টিপস দেয় সারারাত হুল্লোড় করতে কী কী সাবধানতা নিতে হবে বা নেশায় মাতাল হয়ে পড়লে কী কী করতে হবে। পত্রিকা কিন্তু তখন লেখাপড়ার ক্ষতি হওয়ার কথা তোলে না।

এতদিন পর্যন্ত বনধ, ধর্মঘট, অবরোধ, মিছিলের বিরুদ্ধেই মূলত প্রচার চলছিল। এবার যে কোনও আন্দোলনকেই যে কোনও অজুহাতে আক্রমণ করার নতুন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। শাসক শ্রেণির প্রতিভূ রাজনৈতিক দলগুলির নীতিহীন রাজনীতিকে দেখিয়ে প্রতিবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে, গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করার চেষ্টা বৃহৎ পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদমাধ্যম করবেই। সাধারণ মানুষকে, সাধারণ ছাত্রদের আন্দোলনের ময়দান থেকে দূরে সরিয়ে শোষণের পথকে নিষ্কণ্টক করবার প্রচেষ্টা শোষক পুঁজিপতি শ্রেণি করবেই। কিন্তু সাধারণ মানুষকেই বুঝতে হবে এর মধ্যে তাদের মঙ্গল কিছু নেই। সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষাকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে তাদেরই রুখে দাঁড়াতে হবে। রাজনীতিটা মুষ্টিমেয় এলিটের সম্পত্তি হলে মরবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ, তাদের ঘরের সন্তানরাই। তাই সঠিক রাজনীতির দিশা খোঁজার দায়টা তাদেরই বেশি।

তদন্তের দাবি

২৩ এপ্রিল রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু এক প্রেস বিবৃতিতে এস এফ আই নেতা সুদীপ্ত গুপ্ত-র মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে, পুলিশি হেফাজতে মৃত্যুর তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করেন।

৪ এপ্রিল এস এফ আই-এর ছাত্র ধর্মঘটের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানায় এ আই ডি এস ও।

প্রবীণ পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) দলের হুগলি জেলার আবেদনকারী সদস্য কমরেড মহিউদ্দিন মোল্লা ৬ মার্চ ৬৯ বছর বয়সে আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কমরেড মোল্লা ২০০২ সালে দল পরিচালিত বিদ্যুৎ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার পর প্রবল উৎসাহ নিয়ে মগরা-পাণ্ডুয়া এলাকায় বিদ্যুৎ সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলেন। পড়াশুনো বেশি না জানা সত্ত্বেও বিদ্যুতের নানা জটিল সমস্যা সমাধানে গ্রাহকদের সাহায্য করা, নিজে দরখাস্ত লিখে দেওয়া, বক্তব্য রাখা ইত্যাদি নানা গুণ আয়ত্ত করেন। নিজের ছোট ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত করে মানুষের সমস্যা সমাধানে আন্দোলনের ডাকে তিনি বয়সের ভার উপেক্ষা করে বারবার ছুটে গেছেন। বয়সে ছোটরাও যে কোনও ভাষায় সমালোচনা করলে তাঁকে কেউ কোনও দিন রাগতে দেখেনি। ধীরে ধীরে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনেও নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিদ্যুৎ আন্দোলন হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে। দল হারাল একজন উদার মনের মানুষকে।

গত ২১ মার্চ মগরা পেরিওয়াল মার্কেট হলে তাঁর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমরেড মহিউদ্দিন মোল্লা লাল সেলাম

রাঁচিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে চিঠি ছাত্রছাত্রীদের

মহিলাদের উপর ক্রমবর্ধমান অত্যাচারের প্রতিবাদে ৪ এপ্রিল এ আই ডি এস ও রাঁচি জেলা কমিটির উদ্যোগে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিলে সামিল হয়। ফিরায়ালাল চক থেকে মিছিল সর্জনা চকে পৌঁছলে প্রধান ডাকঘরের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে চিঠি পাঠায় ছাত্রছাত্রীরা। সংগঠনের রাঁচি জেলা সম্পাদিকা বহ্নিশিখা সমাজপতি সহ অন্যান্যরা নেতৃত্ব দেন এই কর্মসূচিতে।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বহীন মন্তব্য

রোমের রাজা নিরোর কাহিনী অনেকেরই জানা। রোম যখন জ্বলছিল, তিনি নির্বিকারচিত্তে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। আমাদের দেশের নেতা-মন্ত্রীরাও কিছু কম যান না। তার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিত। তিনি বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি তে জর্জরিত মানুষকে সম্প্রতি উপদেশ দান করেছেন — 'বিল দিতে না পারেন তো বিদ্যুতের ব্যবহার কমান'। রাজ্য তথা দেশবাসীর উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতের এই 'অমূল্য' উপদেশ খবরের শিরোনামে। কিছুদিন আগেই দিল্লিবাসীর উদ্দেশে তাঁর মহান বাণী ছিল — ৫০০-৬০০ টাকা রোজগারে পাঁচ-ছ'জনের সংসার কেন চলে না, তা তিনি বুঝতে পারেন না।

তিনি না বুঝলেও সাধারণ মানুষ তাদের নিত্য অভিজ্ঞতায় জানেন, ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির যুগে সংসার চালানো এবং বাড়তি বিদ্যুৎ বিল মেটানো কত কঠিন। বোঝা যায়, এই মহান গণতন্ত্রের পীঠস্থানে এইসব শাসকেরা মানুষকে কী চোখে দেখেন!

এই উপদেশবাণীতে অবশ্য যারপরনাই উল্লসিত পুঁজির সেবাদাস, দালাল সংবাদমাধ্যমগুলি। এই বক্তব্যের জন্য তারা মুখ্যমন্ত্রীকে প্রভূত ধন্যবাদ জানিয়ে দেশবাসীর উদ্দেশে অমূল্য বাণী বিতরণ করেছে, 'দাম বাড়লে খরচ বেশি করতে হয়। কেন যে এ সমস্ত কথা বলে দিতে হয়!' তারা গ্রাহকদের উদ্দেশে বলেছেন, 'বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বন্টনের খরচ বাড়লে সেই বাড়তি খরচ গ্রাহককেই বহন করতে হবে।' এ জন্য তারা দেশবাসীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'সরকার সার্বজনীন মাতুলালয় নয়।' যদিও তারা যে কথা বলেনি তা হল, সার্বজনীন না হলেও সরকার কারও কারও 'মাতুলালয়' তো বটে! বিদ্যুৎ পরিষেবার বিনিময়ে কোটি কোটি টাকা লাভ করছে যে ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, তাদের জন্য তো অবশ্যই মাতুলালয়ের মতোই আব্দার রক্ষার ঢালাও ব্যবস্থা সরকার করে রেখেছে। তারা আবদার করুক না করুক, তাদের দেওয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা ছাড়। বিদ্যুৎ কোম্পানি ও বাস মালিকদেরও মাতুলালয় সরকার! কর্পোরেট পুঁজির জন্য তো একেবারে কল্পতরু এ দেশের সব সরকার! শুধু বাড়তি মাশুল বা ট্যাক্স দিতে না পারা ও বাড়তি ভাড়া গুনতে না পারা সাধারণ মানুষের কাছে সাক্ষাৎ যমদূত! প্রতি মাসে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ফরমানকে বৈধতা দিতে এবং বাস-ট্রেনের ভাড়া বাড়ানো, গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রশ্নে কোম্পানি মালিকদের দাবিকে আরও জোরালো করতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সব সরকারই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শুনতে বালখিল্য মন্তব্য মনে হলেও কর্পোরেট সংবাদমাধ্যম শ্রীমতী দীক্ষিতের কথার যেভাবে প্রশংসা করেছে তাতেই পরিষ্কার এ দেশের তথাকথিত গণতন্ত্রের ঠাটবাট বজায় রেখে আইনসভা আলো করে বসে থাকা সরকারগুলির মন্ত্রী-নেতারা কাদের প্রতিনিধি!

শিক্ষালয় প্রকল্প ও মিড-ডে মিল কর্মীদের পুনর্বহাল প্রসঙ্গে

১৩ মার্চ বিধানসভায় অধ্যাপক তরুণ নস্কর বলেন, ২০০১ সাল থেকে কলকাতা জেলায় পঃ বঃ সর্বশিক্ষা মিশনের অধীনে শিক্ষালয় প্রকল্পে প্রায় ৭০০ জন শিক্ষাকর্মী ও ৪০০ জন মিড-ডে মিল কর্মী কাজ করছিলেন। তাঁদের দাবি, তাঁরা কলকাতার ১৪১ টি ওয়ার্ডে গত ১১ বছরে ৩০ হাজার শিশুকে শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনে ৫ম শ্রেণিতে ভর্তি করেছিলেন। সর্বশিক্ষা কর্তৃপক্ষ এঁদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষণের প্রশিক্ষণও দিয়েছিল। অথচ গত ৩১ মার্চ থেকে তাঁরা কাজ হারিয়ে বেকার। বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে। এঁদের অধিকাংশ মহিলা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। অর্থনৈতিকভাবে এঁরা সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষ। মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রীকে এঁদের কাজ ফিরিয়ে দেওয়ার তিনি দাবি জানান।

বিপর্যস্ত টম্যাটো চাষিদের রক্ষার দায়িত্ব সরকারেরই

চলতি রবি মরসুমে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় উৎপন্ন হয়েছে রেকর্ড পরিমাণ টম্যাটো। অধিক ফলনে উৎফুল্ল চাষিরা ভেবেছিলেন ন্যায্য মূল্যে টম্যাটো বেচে কিছুটা লাভের মুখ দেখা যাবে। কিন্তু বাড়া ভাতে ছাই। প্রথম দিকে কিছুটা দাম পেলেও এখন ভরা মরসুমে দাম কমতে কমতে এতটাই তলানিতে ঠেকেছে যে টম্যাটোর কেজি প্রতি পাইকারি মূল্য কোথাও ২৫ পয়সা, কোথাও ৫০ পয়সা। জলেরও দাম আছে। এক লিটার জলের দাম ১০-১৫ টাকা। দাম না পেয়ে ক্ষুব্ধ চাষিরা জলপাইগুড়ি জেলার কামাখ্যাগুড়ি, ফালাকাটা, মালবাজার ও তালমাহাটে রাস্তায় টম্যাটো ঢেলে দিয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। কয়েক হাজার কুইন্ট্যাল পাকা টম্যাটো পথে ফেলে দিয়েছেন চাষিরা। উত্তরবঙ্গের বৃহৎ সবজি বাজার হলদিবাড়ির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। পাইকারি বাজারে দামের অস্বাভাবিক পতনে লোকসানের শিকার টম্যাটো চাষিরা।

দক্ষিণবঙ্গের চাষিরা ২ টাকা কেজি দরে বিক্রি করে ক্ষতির মুখে পড়েছেন। উত্তরবঙ্গের চাষিরা ৫০ পয়সা কেজি দরে বিক্রি করে তার চেয়েও ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন। কামাখ্যাগুড়ির পশ্চিম নারারথলির চাষি দয়ানাথ রায় জানালেন, ৮৫ হাজার টাকা কেজি দরে টম্যাটো বীজ কিনতে হয়। পাঁচবার চাষ, ৮ ঠেলাগাড়ি গোবর সার, রাসায়নিক সার, চাপান সার, কীটনাশক, নিড়ানি, বাঁশের কাঠি তৈরি-পোঁতা-বাঁধার খরচ, সেচ, ফসল তোলা, পরিবহন খরচ ইত্যাদি সহ আনুসঙ্গিক আরও খরচ ধরলে এক বিঘা জমি টম্যাটো চাষে কমবেশি ২৫-২৬ হাজার টাকা খরচ হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে না পড়লে উৎপাদন হয় মোটামুটি ১০ হাজার কেজির মতো। এই হিসাবে এক কেজি টম্যাটোর উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায় ২.৫০ টাকার মতো। এর সঙ্গে কৃষকের বেঁচে থাকার খরচ যোগ করে ন্যূনতম দাম নির্ধারণ করা উচিত। কিন্তু করবে কে? করার দায়িত্ব যার উপর বর্তায় সেই সরকার এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। শুধু তৃণমূল সরকারই নয়, পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার বা তারও পূর্বতন কংগ্রেস সরকার বারবারই কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের দাবি উপেক্ষা করে গেছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় এরা কৃষক দরদের ভেক ধরতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু যে কাজটি করলে চাষিদের আড়তদার ও ফড়ে চক্রের এই ভয়াবহ শোষণ থেকে কিছুটা হলেও বাঁচানো যায় সেই কাজটি করার ক্ষেত্রে 'কাজের লোক' ও কাছের লোকে' ভরা পার্টির সরকারগুলির কোনও হেলদোল নেই।

চাষির ফসলের দাম নেই কেন? অর্থনীতির পণ্ডিতরা বলছেন, চাহিদার তুলনায় জোগান বেশি, তাই দাম পড়ছে। সহজ যুক্তিতে এ কথা বলাই যায়, কিন্তু এই যুক্তিতে চাষির প্রাণ তো বাঁচে না। তারা তো উৎপাদন করছে সমাজের জন্য, তারা উৎপাদন করে বাজারে আনলেই সমাজের অন্যান্য মানুষ তা খাদ্য হিসাবে পায়। তাহলে যারা বৃহত্তর সমাজকে খাদ্য জোগায়, তাদের প্রতি বৃহত্তর সমাজের দায় নেই কি? এই দায়টাই সরকারের। কারণ, সরকারও জনসাধারণের দেওয়া ভোটেই নির্বাচিত এবং ভোটের আগে জনগণকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সরকারে বসে সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখা হবে। তাহলে ব্যবসায়ী-ফড়েদের চক্র মিলে যখন দাম নিচে নামিয়ে দেয়, তখন সরকারেরই দায়িত্ব চাষিদের বাঁচানো, তাদের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা করা। সরকার তা না করায় শক্তিশালী শাসক চক্র চাষিদের ফসলের দাম নিয়ে ছিনিমিনি খেলেই চলেছে।

ছাত্রমৃত্যু ঃ নিন্দা বুদ্ধিজীবী মঞ্চের

শিল্পী সাংস্কৃতিক কর্মী বুদ্ধিজীবী মঞ্চের সভাপতি অধ্যাপক তরুণ সান্যাল ৫ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি রূপ আইন অমান্য, যাতে অংশ নিয়ে ছাত্র সুদীপ্তর পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি দাবি করছি। এই প্রসঙ্গে বলতে চাই, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠন বা রাজনীতি করার মধ্য দিয়েই একজন ছাত্র বা যুবকের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা গড়ে ওঠে। ফলে ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক।

টেট পরীক্ষায় অব্যবস্থা ঃ ছাত্র-যুবদের বিক্ষোভ মুর্শিদাবাদে

টেট পরীক্ষায় সরকারি অব্যবস্থার প্রতিবাদে, পরীক্ষা না দিতে পারা পরীক্ষার্থীদের পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা- প্রক্রিয়া কত দিনের মধ্যে সমাপ্ত হবে এবং জেলাভিত্তিক কত শূন্যপদ এবং কত নিয়োগ হবে তা অবিলম্বে প্রকাশ সহ কয়েক দফা দাবিতে এ আই ডি এস ও-এ আই ডি ওয়াই ও মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে বহরমপুরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদক কমরেড অরূপ কুমার দাস, এআইডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদক কমরেড অনুপ সিংহ। পথচলতি মানুষ ও কোর্ট চত্বরের শত শত মানুষ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে পড়েন এবং দাবিগুলির সমর্থনে এগিয়ে আসেন। পরিশেষে পর্ষদ চেয়ারম্যানের কুশপুতুল দাহ করা হয়।

ত্রিপুরায় লোডশেডিং ও বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধিতে বিক্ষোভ

ঘন ঘন লোড শেডিং-এর প্রতিবাদে ত্রিপুরায় ৬ এপ্রিল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) এর উদ্যোগে বিদ্যুৎ নিগমের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। বিক্ষোভ সভা থেকে তিনজনের প্রতিনিধি দল বিদ্যুৎ নিগমের চেয়ারম্যানের উদ্দেশে সাত দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী, কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী এবং কমরেড শিবানী ভৌমিক। বিক্ষোভ সভায় কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী বলেন, রাজ্যব্যাপী ঘন ঘন লোডশেডিং-এর ফলে ক্ষুদ্র শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সহ জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্যে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের অবাধ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যুতের এই সংকটের জন্য দায়ভার বিদ্যুৎভবন ও রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। বিদ্যুৎ সংকট দূর করতে না পারলেও এ বছরও ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানো হয়েছে। এর বিরুদ্ধে সকল গ্রাহকদের ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন গোবিন্দাচার্য

'এ রাজ্যে সব কাজই হয় ঘুষের ভিত্তিতে। একজনও ঘুষ না দিয়ে কাজ পায় না।' মধ্যপ্রদেশ সরকার সম্পর্কে এ কথা অন্য কারও নয়, বলেছেন খোদ বিজেপির মধ্যপ্রদেশের তাত্ত্বিক নেতা কে এন গোবিন্দাচার্য। নির্বাচন এলেই বিজেপির নেতারা স্লোগান তোলেন, এবার বিজেপিকে আনুন, বিজেপি সুশাসন দেবে, রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবে। সেই বিজেপি মধ্যপ্রদেশে, কর্ণাটকে শাসনক্ষমতায় থেকে কেমনতরো সুশাসন দিচ্ছে? এ বিষয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙেছেন গোবিন্দাচার্য। তিনি মধ্যপ্রদেশের শিবরাজ সিং চৌহান সরকারকে 'দুর্নীতির আখড়া' হিসাবে আখ্যা দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এমনকী কংগ্রেসের পূর্বতন দিগ্বিজয় সিং সরকারের থেকেও এই সরকার বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত। কর্ণাটকে বিজেপি নেতা ইয়েদুরাপ্পার দুর্নীতির তো সীমা-পরিসীমা নেই। কিছুদিন আগে বিজেপি সভাপতি নীতিন গড়কড়ির কয়লা ব্লক বরাত দেওয়া সহ বহু দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগে দেশ তোলপাড় হয়েছিল। পরিস্থিতির চাপে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বাধ্য হয়েছিল তাঁকে সরিয়ে রাজনাথ সিং-কে সভাপতি করতে। এত কিছুর পর সম্প্রতি বিজেপির লোকদেখানো দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ঘোষণা ভন্ডামি ছাড়া আর কী?

গোবিন্দাচার্য বলেছেন, মধ্যপ্রদেশ সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী-আমলাদের বিরুদ্ধে মামলার পাহাড় জমে আছে লোক আদালতে। বলেছেন, ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপির নেতা-মন্ত্রী যাঁদের তেমন কিছুই ছিল না, তাঁদের এখন গাড়ি-বাড়ি সহ নানা সম্পদের প্রাচুর্য। স্বনামে-বেনামে তাঁরা একাধিক কোম্পানির মালিক। প্রভূত সম্পদ, বিপুল আয়, রমরমা ব্যবসার অধিকারী এবং রিয়েল এস্টেটে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগকারী নেতারা জীবনযাপনেও অত্যন্ত বিলাসী। এরাই আবার অনায়াসে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে।

এইটুকু শুনেই এ রাজ্যের পাঠকের মনে হতে পারে, এ যেন পূর্বতন সিপিএম শাসনেরই কার্বনকপি। শুধু দুর্নীতির প্রশ্নেই নয়, গোবিন্দাচার্য পশ্চিমবঙ্গে সিপিএমের নির্বাচনী কৌশলের সাথে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের নির্বাচনী কৌশলের তুলনা করে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে তবুও নিঃশব্দে রিগিং হয়, কিন্তু মধ্যপ্রদেশে রিগিং হয় খোলাখুলি সকলের সামনে। অর্থবল ও পেশিশক্তির এতটাই জোর যে, কেউ টুঁ শব্দটি করতে পারে না। 'পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স'-এর যে ধ্বজা বিজেপি ওড়াত তা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য সংসদীয় বাম-ডান দলগুলির মতো কি দুর্নীতিতে, কি সন্ত্রাসের পথে ভোটে জেতার প্রশ্নে একই আসামীর কাঠগড়ায় বিজেপি। আর যাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে বিজেপি তুলে ধরছে, সেই নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আর্থিক অসংগতির অভিযোগ তুলেছে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (সি এ জি)।

এ হেন বিজেপি দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের ঘোষণা করেছে। এর উদ্দেশ্য যে নির্বাচনী আবহাওয়া তৈরি করা, তা মানুষ ভালোভাবেই জানে। আজ আর তাদের শুধুমাত্র ধর্মের জিগির তুলে কার্যসিদ্ধি হচ্ছে না। তাই তারা দুর্নীতিবিরোধী ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। জনসাধারণের চোখে এই সমস্ত দলগুলির দুর্নীতি, নেতাদের পুকুরচুরি, স্বজনপোষণ এবং সুশাসনের নামে মিথ্যার বেসাতি এমনভাবে ফুটে বেরোচ্ছে যে, ভোটে জনগণের উপর নির্ভর করে এরা কেউই জিততে পারবে না। তাই গোটা দেশেই রিগিং, মিডিয়া পাওয়ার, মানি পাওয়ার আর মাসল পাওয়ারের ভিত্তিতেই নির্বাচন হচ্ছে। এই হল 'বৃহত্তম গণতন্ত্রের' পীঠস্থান পুঁজিবাদী ভারতের মহিমা!

মোদীর রাজ্যে উচ্ছেদ হওয়া মানুষ আত্মহত্যার মধ্যে প্রতিকার খুঁজছে

পশ্চিমবঙ্গের যে সংবাদপত্রগুলি 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট'-এর দামামা বাজায়, সর্বদা প্রচার করে গুজরাট উন্নয়নে উজ্জ্বল, সেই সংবাদপত্রগুলিও না ছেপে পারেনি মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনের এক মর্মান্তিক চিত্র। গত ৩ এপ্রিল রাজকোট পুরসভার সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে বহু মানুষের সামনে এক পরিবারের পাঁচজন সদস্য গায়ে আগুন দিয়ে দেখিয়ে গেলেন রাজ্যে কী দুঃশাসন চলছে। রাজকোট শহরের যে এলাকাটিতে তাঁরা থাকতেন, সম্প্রতি সেই এলাকা থেকে তাঁদের উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। পরিবার-পরিজন নিয়ে কোথায় থাকবেন এই আশঙ্কাতেই ঐ পরিবার আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

এই ঘটনা গুজরাটের বহু মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছে। মুভমেন্ট ফর সেক্যুলার ডেমোক্রেসি (এম এস ডি) নামে একটি সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঘটনার পরদিন রাজ্যপালকে স্মারকলিপি দিয়ে বলেন, গুজরাট সরকার ও প্রশাসনের অমানবিক আচরণের জন্য এ রাজ্যে আত্মহত্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে তাঁরা উদ্বিগ্ন। রাজ্যপালকে তাঁরা বলেন, গরিবদের ৫০ হাজার বাসস্থান দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের প্রাক্কালে মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিয়েছিলেন তা পালন করলে এ ধরনের ঘটনা না-ও ঘটতে পারত। তাঁরা বলেন, বহুজাতিক কোম্পানিগুলিকে জলের দরে জমি দেওয়া হচ্ছে, অথচ গরিবদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। তাঁরা জমি-মাফিয়াদের কবল থেকে গুজরাটকে মুক্ত করার আবেদন জানান। স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেন প্রকাশ এন শাহ, ইলা পাঠক, রোহিত শুক্লা, দিলীপ চন্দুলাল, দ্বারিকানাথ রথ সহ বহু বিশিষ্টজন। ৪ এপ্রিল বিশিষ্ট নাগরিকরা মোমবাতি মিছিল করে ঘটনার প্রতিবাদ জানান এবং তদন্তের দাবি করেন।

টেট-এ বসতে দেওয়ার দাবি জানাল বি পি টি এ

সরকারের চূড়ান্ত অব্যবস্থায় যারা ৩১ মার্চ টেট পরীক্ষায় বসতে পারেনি তাদের দ্রুত পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়ার দাবিতে ৩ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে ডেপুটেশন দেয় বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও শিক্ষা সচিব অরুণ রায়কেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় জেলা ভিত্তিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং শূন্য পদের সংখ্যা (বিভিন্ন ভাষাভাষী ও ক্যাটাগরি ভিত্তিক) প্রকাশ করতে হবে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা জানান কলকাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ,পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও কোচবিহার প্রভৃতি জেলায় সংসদ ও চেয়ারম্যান এবং ডি আইদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

কোরিয়া ঘিরে যুদ্ধ উত্তেজনার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই দায়ী

উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কোরীয় উপদ্বীপ। সংবাদমাধ্যম সরগরম সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার শক্তি প্রদর্শন নিয়ে। তাদের ভাবখানা এমন, যেন ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি ও পরমাণু বোমা নির্মাণে নতুন কৃতিত্ব লাভের উন্মাদনায় খেপে উঠে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তব ঠিক এর বিপরীত।

উত্তর কোরিয়া কি যথার্থই বিপদ মার্কিন শাসকদের কাছে? আদপেই নয়। দক্ষিণ কোরিয়াও কি বিপন্ন বোধ করে উত্তর কোরিয়ার অস্ত্র সম্ভারে? উত্তর কোরিয়া কি কখনও দক্ষিণকে আক্রমণ করেছে? দুইয়েরই উত্তর — কখনওই নয়। শুধু তাই নয়, উত্তর কোরিয়ার শাসক ও জনগণ বরাবরই দুই কোরিয়ার পুনর্মিলনের জন্য বলেছে, উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু মার্কিন ষড়যন্ত্রে বারবার তা ভেস্তে গিয়েছে। আরও জানার বিষয় হল, দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের বিরাট অংশও চায়— উত্তর ও দক্ষিণ মিলে আবার একটি কোরিয়া হোক।

তাহলে বিরোধের জায়গা কোথায়? আসলে কোরিয়াকে নিয়ে যুদ্ধ ও পরবর্তীকালে যুদ্ধ উত্তেজনা—দুইই আমেরিকার সৃষ্টি। মার্কিন প্রচারমাধ্যম সর্বদা উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়াকে 'পরস্পর শত্রু রাষ্ট্র' রূপে দেখিয়ে বলে, উত্তর দক্ষিণ সংঘর্ষ অনিবার্য এবং সেখানে সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার আক্রমণ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ও ঐ অঞ্চলে অন্যান্য মার্কিন মিত্র দেশগুলিকে রক্ষার জন্যই মার্কিন সৈন্য, অস্ত্র, যুদ্ধজাহাজ ইত্যাদি পাঠানো হচ্ছে।

পূর্ব ও দক্ষিণ চীন সাগরে নিজের প্রতিপত্তি দেখাতে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়েছে এবং সমুদ্রে পরমাণু অস্ত্র নিক্ষেপকারী মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান মোতায়েন করেছে। এই মহড়ায় অংশ নিয়েছে ২৫ হাজার মার্কিন সেনা ও দক্ষিণ কোরিয়ার ৫৩ হাজার সৈনিক। অবস্থা এমনই যে, ভারতের বহুল প্রচারিত পুঁজিবাদী সংবাদপত্র পর্যন্ত তার সম্পাদকীয়তে আমেরিকার এই শক্তি প্রদর্শনকে 'বিপুল ও ভারসাম্যহীন' অর্থাৎ পরিস্থিতির তুলনায় অনেক বেশি বলে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছে।

উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে মিথ্যাপ্রচার চালিয়ে বিশ্ব জনমতকে বিভ্রান্ত করে আমেরিকার শাসকরা আসলে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন সামরিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার এবং চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসী পদক্ষেপ করার মতলবকে আড়াল করতে চায়। একসময় রাশিয়া ও চীন সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়ার কারণেই সাম্রাজ্যবাদীদের 'শত্রু রাষ্ট্র' ছিল এবং স্বভাবতই এই দুই রাষ্ট্রকে টার্গেট করে সমরসজ্জা চালিয়েছিল আমেরিকা। চীন ও রাশিয়া পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত হওয়ার পরও মার্কিন টার্গেট হিসাবে রয়ে গিয়েছে, কারণ এই দুই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রই বিশ্ব বাজারে মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বী। সামরিক শক্তিতেও এরাই কেবল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে টক্কর দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

অনেকের হয়ত স্মরণে আছে কিছুকাল আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা সিঙ্গাপুরে এসে ঘোষণা করেন যে, আগামী দিনে মার্কিন সমরসজ্জা আটলান্টিক মহাসাগরে ৫০ শতাংশ কমিয়ে তা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সরানো হবে।

ফলে, এই অঞ্চলে সামরিক উত্তেজনা তৈরি করা ও তা জিইয়ে রাখা মার্কিন পরিকল্পনারই অংশ। সেখানে উত্তর কোরিয়াকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমেরিকার ভূমিকা মাফিয়া সর্দারের

মার্কিন যুদ্ধ প্ররোচনার প্রতিবাদে পিয়ংইয়ংএ গণবিক্ষোভ

সাথেই মিলে যায়। মাফিয়ারা যেমন কোনও এলাকায় মানুষকে 'রক্ষা' করার বিনিময়ে তাদের আনুগত্য ও জো-হুজুর মানসিকতা দাবি করে, অন্যথা করলে যেমন ঘর জ্বালিয়ে দেয়, খুন করে, হুমকি-ভয় দেখায়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও তেমনি উত্তর কোরিয়াকে হুমকি দিয়ে বলছে— আমেরিকার বশ্যতা মানতে হবে।

আমেরিকার এই বাসনা অনেকদিনের। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দেখে যে, কোরিয়া দ্বীপপুঞ্জের জনগণ প্রবলভাবেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং তারা পুঁজিবাদী গণতন্ত্র নয়, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র কামনা করে। কোরিয়াবাসীর এই মানসিকতাই কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানি সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াইয়ের প্রেরণা হয়ে কাজ করেছে, বীভৎস অত্যাচারের মুখেও তারা নতজানু হয়নি। এ সত্য বুঝেই কোরিয়ার জনগণের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনকে ধ্বংস করতে মার্কিন শাসকরা জোর করে উত্তর ও দক্ষিণ দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দেয় জনগণকে। অথচ লক্ষণীয় ঘটনা হল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে জাপানি ফ্যাসিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করার কথা বলে মার্কিন শাসকরা যুদ্ধ করেছে, কোরিয়াকে জোর করে বিভক্ত করার পর নবনির্মিত দক্ষিণ কোরিয়ার শাসনক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের, যারা জাপানি সাম্রাজ্যবাদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। এ থেকেই তো বোঝা যায় মার্কিন মতলব শুরু থেকেই কী ছিল।

হিরোসিমা-নাগাসাকিতে আমেরিকার অ্যাটম বোমা নিক্ষেপও ছিল সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের বিরুদ্ধে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্য কায়েমের চেষ্টারই অবিচ্ছেদ্য অংশ, ঠিক যে কারণেই কোরিয়াকে দুই 'শত্রু রাষ্ট্রে' ভাগ করে ১৯৫০-৫৩ সাল ধরে তাদের যুদ্ধে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।

ঐ যুদ্ধে মার্কিন বোমা বর্ষণ ও নাপাম বোমার আগুনে কোরিয়ার ৩০ শতাংশের বেশি জনগণ ধ্বংস হয়ে যায়। যুদ্ধের সমাপ্তি আমেরিকা কখনও ঘোষণা করেনি। ১৯৫৩ সালে আমেরিকার হুকুমে যে অস্ত্রসংবরণ চুক্তি হয়েছিল, সেটা আদতে ছিল কেবল একটি যুদ্ধবিরতির চুক্তি। তারপর দশকের পর দশক ধরে উত্তর কোরিয়া পূর্ণ শান্তি চুক্তি করার দাবি জানালেও তা প্রত্যাখ্যান করেছে আমেরিকা ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া। যার অর্থ দাঁড়ায়, আমেরিকা তার পছন্দমতো যে কোনও সময় উত্তর কোরিয়ার জনগণের উপর আকাশপথে বোমা বর্ষণ চালাতে পারে। অর্থাৎ উত্তর কোরিয়া সর্বদা মার্কিন আগ্রাসন এবং হুমকির মুখে মার্কিন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

এই হুমকি কেবল যুদ্ধের নয়, আণবিক অস্ত্রের দ্বারা গণহত্যারও হুমকি। কোরিয়ার যুদ্ধের সময় আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান কোরিয়া দ্বীপপুঞ্জের আকাশে উড়ত। নিচের মানুষ বুঝত না ওই বিমান কী অস্ত্র বহন করছে, বিমান দেখলেই আতঙ্কে ছুটত, গুহায় আশ্রয় নিত বাঁচার জন্য। এর থেকে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস কী হতে পারে?

এই দস্যুবৃত্তিরই ধারায় সম্প্রতি আবার কোরীয় দ্বীপপুঞ্জের আকাশপথে বি-২ ও বি-৫২ বোমারু বিমান চালনার হুকুম দিয়ে আমেরিকা বুঝিয়ে দিয়েছে তার মতলব। এরপরও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বলছে, তার সকল কীর্তিকলাপ নাকি দক্ষিণকে 'নিরাপত্তা' দেওয়ার জন্য। এই মিথ্যাই মার্কিন ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কর্পোরেট মিডিয়া প্রচার করে যাচ্ছে। অথচ কোরিয়ার জনগণ যে যুদ্ধ চায় না, পরিপূর্ণ শান্তি চায়, এ কথাটা কেউ প্রচারে আনছে না। কারণ কোরিয়ার জনগণের কথা তুললেই, 'রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক' এই প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে হবে যে, তাদের দেশের নিকটবর্তী সমুদ্রে প্রতি বছর সামরিক মহড়া চালাবার অধিকার মার্কিন শাসকদের কে দিয়েছে?

সমস্যা হল, এই মাফিয়াসুলভ ক্রিমিনাল কার্যকলাপ মার্কিন শাসকরা বন্ধ করতে পারে না। যুদ্ধ আগ্রাসন না চালাতে পারলে সাম্রাজ্যবাদ যে কবরে চলে যাবে। মার্কিন বা পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের মধ্যে 'স্বাধীনতা' ও 'ব্যক্তির অধিকার' খুঁজে পেয়ে যাঁরা আহ্লাদ বোধ করেন, তাঁরা মার্কিন শাসকদের এই দস্যুবৃত্তিকে কী চোখে দেখছেন, তাঁরাই বলতে পারেন।

উত্তর কোরিয়ার প্রতি সংহতি জানাল আই এ সি সি

ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-ইম্পিরিয়ালিস্ট কো-অর্ডিনেটিং কমিটি (আই এ সি সি)-র সাধারণ সম্পাদক এবং এস ইউ সি আই (সি) পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী গত ২ এপ্রিল ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অব কোরিয়া (ডিপিআরকে)-র সর্বোচ্চ নেতা কমরেড কিম জং উনের উদ্দেশে নিম্নলিখিত বার্তা পাঠিয়েছেন।

কমরেড উনকে বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়ে এবং পরমাণু বোমা নিক্ষেপে সক্ষম বোমারু বিমান মোতায়েন করে কোরীয় উপদ্বীপে যুদ্ধ উত্তেজনা সৃষ্টি করার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাম্প্রতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বের শান্তিপ্রেমী মানুষ খোলাখুলি মত প্রকাশ করছেন। সমাজতান্ত্রিক উত্তর কোরিয়ার উপর আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার বর্তমান সরকারকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক এই রাষ্ট্র ধ্বংস করার সাথে সাথে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মুছে ফেলার ঘোষিত উদ্দেশ্য সফল করতেই দক্ষিণ কোরিয়ার এই ষড়যন্ত্র। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সমাজতন্ত্র রক্ষার্থে উত্তর কোরিয়া রাষ্ট্র ও তার জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধকে ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন করছে গোটা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষ। দক্ষিণ কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন প্রতিরোধে এবং আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার্থে সমস্ত সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার উত্তর কোরিয়ার সার্বভৌম অধিকারের প্রতি আমাদের সমর্থন জানাই। এই আগ্রাসনের সমস্ত দায়িত্বই বর্তাবে দক্ষিণ কোরিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর। এই সংগ্রামে গোটা বিশ্বের মানুষের সাথে আমরাও ডিপিআরকে-র পাশে আছি।

মৌলবাদী শাসকদের বিরুদ্ধে তিউনিশিয়ায় বিক্ষোভ

গত ১৬ মার্চ তিউনিশিয়ায় হাজার হাজার মানুষ রাজধানী শহরে সমবেত হয়ে মৌলবাদের অবসানের আওয়াজ তুললেন। উত্তর আফ্রিকার এই দেশটির জনগণ মূলত মুসলিম ধর্মাবলম্বী। এ রকম একটি দেশে 'মৌলবাদ নিপাত যাক' স্লোগান রাজনৈতিক-সামাজিক দিক থেকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মৌলবাদের বিরুদ্ধে মানুষ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন বিশিষ্ট বামপন্থী নেতা চোকরি বিলেদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি তাঁর বাড়ির সামনে একদল দুষ্কৃতী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে মোটর সাইকেলে পালিয়ে যায়। তখনই অভিযোগ উঠেছিল এর পেছনে রয়েছে ক্ষমতাসীন মৌলবাদী সরকারের হাত। কারণ, পেশায় আইনজীবী এই মানুষটি পার্লামেন্টে মৌলবাদী সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী কাজের কট্টর সমালোচক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর দু'দিন পর দশ সহস্রাধিক মানুষ শোকমিছিলে সামিল হয়ে এই প্রতিজ্ঞাই ঘোষণা করেছিলেন যে, মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলবে।

মৌলবাদের মোড়কে তিউনিশিয়ার বুর্জোয়া শাসন বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতিকে ব্যাপকতর করেছে। সম্প্রতি এক বেকার যুবক বেকারত্ব থেকে পরিত্রাণ পেতে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। এই ঘটনা দেশের মানুষকে আবারও আন্দোলনের পথে নামিয়েছে।

২০১১ সালের জানুয়ারিতে সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট দীর্ঘকালের স্বৈরশাসক জিনে এল আবিদিন বেন আলিকে মানুষ গণজাগরণের মধ্য দিয়ে সরিয়েছিল, যে গণজাগরণকে মহিমান্বিত করে বলা হয়েছিল 'আরব বসন্ত'। তারপরে গণভোটের মধ্য দিয়ে মৌলবাদী সরকার ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু সেই সরকারও জনজীবনে স্বস্তি দেওয়ার পরিবর্তে সংকটের বোঝা বাড়িয়েছে। দেশের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি বেকার। জনজীবনের করের বোঝা বাড়ছে, ছাঁটাই করা হচ্ছে পাবলিক খাতে ভরতুকি। এই অর্থনৈতিক সংকটই মৌলবাদ বিরোধী বিক্ষোভে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

কমিউনিস্ট ইশতেহার রচনার পথে মার্কস-এঙ্গেলস

(১৮৪৮ সালে রচিত কমিউনিস্ট ইশতেহারের ১৬৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত নিবন্ধের শেষাংশ।)

মার্কস ও এঙ্গেলস বহু বছর ধরে মতাদর্শগত ও সংগঠনগত কাজ করে আসছিলেন প্রোলেতারিয়েতকে এ কথা বোঝাতে যে, তাদের চাই একটি স্বাধীন রাজনৈতিক পার্টি এবং এমনই একটি পার্টি তাদের সৃষ্টি করতে হবে। মার্কসের সাগ্রহ আকাঙ্ক্ষার এই ছিল লক্ষ্য। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে শ্রমিকশ্রেণির পার্টি সম্পর্কে তাঁর ও মার্কসের মূলগত দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃত করার প্রতিবাদে এঙ্গেলস লিখেছিলেন, মার্কস ও আমি কথাটা ১৮৪৭ সাল থেকেই বলে আসছি — "সিদ্ধান্তের দিনে প্রোলেতারিয়েত যাতে জয়ী হওয়ার মতো শক্তিশালী হতে পারে সেজন্যে প্রয়োজন প্রোলেতারিয়েতের বিশেষ একটি পার্টি, অন্য সমস্ত পার্টি থেকে ভিন্ন ও তাদের বিরুদ্ধাচারী পার্টি, শ্রেণি-সচেতন পার্টি।" এই গুরুত্বপূর্ণ ধারণাটি হয়ে ওঠে মার্কসবাদের স্তম্ভ, মার্কসবাদের বিশ্বব্যাপী বিজয়ের পূর্বশর্ত।

লিগের সভ্য সংখ্যা ছিল বড় জোর পাঁচশো। কিন্তু কমিউনিস্ট লিগ যতই ছোট হোক — মার্কস কিন্তু পরিষ্কার দেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে বার বার জোরের সঙ্গে বলেছেনও যে, লিগের মধ্যে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণির সমগ্র ভবিষ্যৎ ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। লিগের কর্মসূচি ও লিগের সভ্যপদ অনুযায়ী লিগ ছিল শ্রমিক শ্রেণির একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, একই সঙ্গে প্রথম জার্মান শ্রমিক পার্টিও। মুখ্যত জার্মান শ্রমিকরা, প্রোলেতারিয় ঠিকা শ্রমিকরা এবং শ্রমিক শ্রেণির মূলনীতি অনুমোদন করেন, এমন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিরা ছিলেন লিগের অনুগামী। ব্যাপারটা আকস্মিক নয়, কেন না ১৮৪০-এর দশকের জার্মানি ছিল ইউরোপের সামাজিক রাজনৈতিক ও জাতীয় দ্বন্দ্বগুলির সংযোগক্ষেত্র। এইভাবে কমিউনিস্ট লিগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল জার্মান শ্রমিক শ্রেণির পার্টির ইতিহাস।

১৮৪৭ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে লন্ডনে থাকার সময়ে মার্কস এই রাজধানী নগরের রাজনৈতিক গণ-জীবনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। অন্য সব জায়গায় যেমন, এখানেও তেমনি তাঁর ছিল সেই একই নীতি ঃ "বিজ্ঞান কখনও ব্যক্তিগত অহঙ্কারের বিষয় হওয়া উচিত নয়। বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করার সৌভাগ্য যাঁরা লাভ করেছেন, মানবজাতির কল্যাণে নিজের জ্ঞান নিয়োজিত করতে তাঁদেরই সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসা উচিত।"

ইংরেজ ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণির সমস্যা নিয়ে চার্টিস্ট নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন মার্কস। ব্রুসেল্‌স গণতান্ত্রিক সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা এবং ১৮৪৮ সালের শরৎকালে একটি আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক কংগ্রেস ডাকার বিষয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম গণতন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

২৯ নভেম্বর তারিখে বহু জাতির থেকে আসা গণতন্ত্রীদের একটি সভায় মার্কস ও এঙ্গেলস যোগ দিয়েছিলেন। সভার উপলক্ষ ছিল ১৮৩০ সালের পোলিশ অভ্যুত্থানের ১৭ তম বার্ষিকী উদযাপন। এই সভায় মার্কস আওয়াজ তুললেন জাতীয় নিপীড়ন ও যুদ্ধের সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া নীতির বিরুদ্ধে। জোরের সঙ্গে তুলে ধরলেন প্রোলেতারিয়েতের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যসাধনের ভূমিকা, যার দ্বারা একমাত্র প্রোলেতারিয়েতই পারে জাতির জীবন থেকে শোষণ ও নির্যাতন লোপ করতে, যুদ্ধকে চিরতরে হটাতে। মার্কস ঘোষণা করলেন, "বুর্জোয়াদের ওপরে প্রোলেতারিয়েতের জয়লাভ একই সঙ্গে জাতিগত ও শিল্পগত সঙ্ঘর্ষগুলির ওপরেও জয়লাভ, যে-সঙ্ঘর্ষগুলি থাকার দরুন আজকের দিনে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী একে অপরের বিরুদ্ধে বৈরিতায় লিপ্ত হচ্ছে। অতএব বুর্জোয়াদের ওপরে প্রোলেতারিয়েতের জয়লাভ একই সঙ্গে সকল নির্যাতিত জাতির মুক্তিলাভের সংকেতও।" এইভাবে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী পার্টির একেবারে জন্মলগ্নেই মার্কস দেখালেন, শান্তি ও সমাজতন্ত্র অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত এবং প্রোলেতারিয়েত যতখানি সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের সঙ্গে আপন জাতি ও সকল জাতিগোষ্ঠির শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করে এমন অন্য কোনও শ্রেণি নয়।

লিগ অব জাস্ট ১৮৪০ সালে লন্ডনে একটি বৈধ সংগঠন খাড়া করেছিল। সংগঠনটির নাম 'কমিউনিস্ট শ্রমিকদের শিক্ষামূলক সমিতি'। এই সমিতির সদস্যরাও গভীর আবেগের সাথে মার্কসের সঙ্গে একটি বৈঠকে মিলিত হলেন। কংগ্রেসের একজন প্রতিনিধি হিসেবে মার্কস তাঁদের কাছে নিজের কাজ সম্পর্কে এবং ব্রাসেলস-এর জার্মান শ্রমিক সমিতির তৎপরতা সম্পর্কে বিবরণ দিলেন।

লন্ডন সমিতির সংস্পর্শে এসে মার্কস এই মর্মে মতপ্রকাশ করতে শুনলেন যে, কমিউনিজমের উদ্ভব খ্রিস্টধর্ম থেকে, যে-মতের পোষক ছিলেন ভাইটলিঙ্ক। শ্রমিকদের কাছে মার্কস তখন ব্যাখ্যা করলেন ধর্মের ঐতিহাসিক চরিত্র ও ক্রিয়া। তাঁদের কাছে উপস্থিত করলেন ধর্ম সম্পর্কে আধুনিক সমালোচনামূলক গবেষণা ও নিরীশ্বরবাদী জার্মান সাহিত্য। এইভাবে সমস্যাটিকে কোনও রকমেই হেয় না করে তাঁদের চালিত করলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দিকে।

তাঁর শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন একজন ঠিকা কাজের দরজি, নাম ফ্রেডরিখ লেসনার। পরে তিনি মার্কসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়েছিলেন। লন্ডনের এই দিনগুলিতে তাঁর কী ধারণা হয়েছিল তার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি

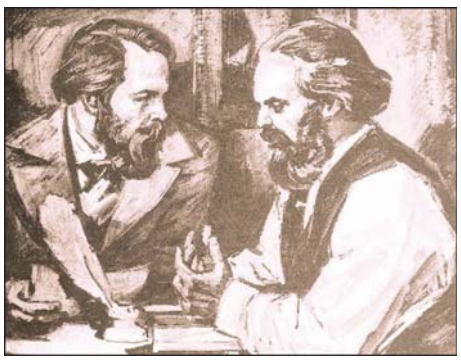

লিখেছেন, "মার্কস তখন প্রায় আঠাশ বছর বয়সের যুবক, তবুও তিনি আমাদের সকলের ওপরে গভীর ছাপ ফেলেছিলেন। মাঝারি উচ্চতা ও চওড়া ঝাঁধের মানুষটির গড়ন ছিল শক্তসমর্থ, হাবভাব ছিল প্রাণোচ্ছল। তাঁর কপাল ছিল উঁচু ও সুগঠিত, চুল ঘন ও কুচকুচে কালো, দৃষ্টি মর্মভেদী। তাঁর মুখের যে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমাটিকে তাঁর বিরোধীরা এত ভয় করে সেটি তখনই তাঁর মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল। মার্কস জন্মেছিলেন জনগণের নেতা হওয়ার জন্য। তাঁর বক্তৃতা হত সংক্ষিপ্ত, আঁটোসাঁটো — বক্তৃতার যুক্তি সকলকে অভিভূত করত। একটিও বাড়তি শব্দ ব্যবহার করতেন না। প্রত্যেকটি বাক্যে প্রকাশ পেত তাঁর চিন্তা। প্রত্যেকটি চিন্তা হয়ে উঠত তাঁর যুক্তি বিস্তারের ধারাসূত্রে এক-একটি সংযোজক। মার্কসের মধ্যে স্বপ্নালুতা কিছুমাত্র ছিল না। যতই আমি ভাইটলিঙ্ক যুগের কমিউনিজম ও কমিউনিস্ট ইশতেহারের যুগের কমিউনিজমের পার্থক্য অনুধাবন করেছি ততই আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে মার্কস হচ্ছেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তার পরিণত রূপটির প্রতিভূ।"

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের জন্মপত্রিকা

কমিউনিস্ট লিগের দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষ হবার পরে ডিসেম্বর মাসে মার্কস ফিরে এলেন ব্রুসেল্‌সে, এঙ্গেলস প্যারিসে। তাঁদের ওপরে যে ভার ছিল—একসঙ্গে বসে লিগের একটা কর্মসূচি রচনা করা—দূরে দূরে থাকার দরুন তা পালনে অসুবিধা হতে লাগল। ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে, ১৮৪৮ সালের জানুয়ারির শেষাশেষি লন্ডনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে মার্কস একটি তাগিদ-পত্র পেলেন। পত্রের মর্ম, তিনি যেন পাণ্ডুলিপিটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দেন নতুবা "তাঁর বিরুদ্ধে আরও ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে"। পত্রটি যখন পৌঁছল, মূল্যবান পাণ্ডুলিপিটি কিন্তু তার আগেই যাত্রা করেছে এবং ঠিক সেই মুহূর্তে লন্ডনের পথে। লন্ডনের বিশপ্সগেট-এ ৪৬ লিভারপুল স্ট্রিটের ছোট্ট একটি ছাপাখানায় পাণ্ডুলিপিটি ছাপা হল। ছাপার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করলেন ফ্রেডরিখ লেসনার, প্রুফ পড়লেন কার্ল শাপের, ফেব্রুয়ারি মাসের শেষদিকে প্রকাশিত হল ২৩ পৃষ্ঠার ছোট্ট সাদাসিধে চেহারার পুস্তকটি ঃ 'মানিফেস্ট ডেয়ার কমুনিস্টিশেন পার্টাই,'— কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার। কমিউনিস্ট লিগের সংগঠনগুলির জন্য পাওয়া গেল মাত্র কয়েকশো কপি, হাতে হাতে পুস্তিকাটি ঘুরতে লাগল। এই ছোট পুস্তিকাটিতে মার্কস ও এঙ্গেলস এমন একটি রচনা উপস্থিত করেছেন যা প্রকৃত অর্থেই ইতিহাস-সৃষ্টিকারী ও অনন্যসাধারণ। এমন একটি রচনা যার উজ্জীবনী শক্তি প্রথম থেকেই প্রকাশমান, আমাদের কালেও প্রতিদিনই প্রকাশ পাচ্ছে।

এই ক্ষুদ্র রচনাটির এমন বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী জন্য?

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের প্রথম কর্মসূচিগত দলিল। মার্কস ও এঙ্গেলস ১৮৪৩ থেকে ১৮৪৮ সালের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ও বাস্তব অভিজ্ঞতায় যা-কিছু আয়ত্ত করেছেন, সমগ্র শ্রমিক শ্রেণির অভিজ্ঞতা সহ, সমস্তই সূত্রবদ্ধ করেছেন এই ইশতেহারে, দক্ষতাপূর্ণ ভাষায়। ইশতেহারে তাঁরা উপস্থিত করেছেন, আঁটোসাঁটো ও সুবিন্যস্ত আকারে, তাঁদের তত্ত্বের ভিত্তি ঃ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ, অর্থনীতি-বিজ্ঞান, শ্রেণি-সংগ্রামের শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ। কমিউনিজম সম্পর্কে মিথ্যা ও কুৎসা, রূপকথা ও কল্পকাহিনীর বিরোধিতা করে তাঁরা সাহসের সঙ্গে ও খোলাখুলি ঘোষণা করেছেন শ্রমিকশ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা, শ্রমিকশ্রেণির সংগ্রামের গতিমুখ ও লক্ষ্য।

"ইউরোপে হানা দিয়ে ফিরছে একটি আতঙ্ক—কমিউনিজমের আতঙ্ক। এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে পুণ্য অভিযানে জোটবদ্ধ হয়েছে ইউরোপের সকল শক্তি— পোপ ও জার, মেটারনিখ ও গীজো, ফরাসি র‍্যাডিকাল ও জার্মান পুলিস ...।"

"এই ঘটনা থেকে দুটি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে।

"কমিউনিজম যে একটা শক্তি তা ইউরোপের সকল শক্তি ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছে।

"সময় এসে গিয়েছে যখন কমিউনিস্টদের উচিত খোলাখুলি, গোটা বিশ্বের মুখের ওপরে তাঁদের মত, তাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের অভিমুখ প্রকাশ করা এবং কমিউনিজমের আতঙ্কের নামে যে ছেলেভোলানো গল্প চলছে তার জবাবে পার্টির একটি ইশতেহার প্রকাশ করা।"

চিত্তগ্রাহী এই কথাগুলো দিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস তাঁদের কর্মসূচিগত রচনা শুরু করলেন।

ইশতেহারের প্রথম অধ্যায়ে তাঁরা দেখালেন শ্রেণি-সংগ্রামের নির্ধারক সম্মুখগতিসম্পন্ন ভূমিকা। তাঁরা দেখালেন — গোড়ার দিকে, সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুঁজিতন্ত্র সমাজের রূপান্তর সাধন করেছিল বৈপ্লবিক ধরনে, শুরুতে পুঁজিতন্ত্র ছিল প্রগতিশীল, কিন্তু এখন অনিবার্যভাবেই পুঁজিতন্ত্র হতে চলেছে সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে অধিক থেকে অধিকতর মাত্রায় একটি বাধা। তার সুনিশ্চিত প্রমাণ— অর্থনৈতিক সংকট ও যুদ্ধ, যাতে উৎপাদনের শক্তিগুলি ব্যাপকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

মার্কস ও এঙ্গেলস তারপরে বিশ্লেষণ করে উপস্থিত করলেন পুঁজিবাদী মজুরি-দাসত্বের সারকথা এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রোলেতারিয়েতের সংগ্রামের পৃথক পৃথক পর্বগুলো। তাঁরা দেখালেন— পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্যভাবেই প্রোলেতারিয়েতের বাড়বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রোলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে বিরোধিতা ও শ্রেণি-সংগ্রাম তীব্র হয়। বুর্জোয়াদের অমোঘ ভবিতব্য— তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খনন করে। আর প্রোলেতারিয়েত নিজেদের সংগঠিত করে শ্রেণি সংগ্রামে। তারা রাজনীতিগতভাবে বিকশিত হয় এবং তাদের বৈপ্লবিক ঐক্যের মধ্যে যে সম্ভাবনা ও শক্তি নিহিত রয়েছে সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। পরিশেষে, শ্রেণি-সংগ্রাম বিকশিত হয়ে উঠে যে-ঘটনার দিকে নিয়ে যায় তা হচ্ছে গৃহযুদ্ধ— পুঁজিবাদী সমাজে যা কম-বেশি অপ্রত্যক্ষ— যে গৃহযুদ্ধ "ফেটে পড়ে প্রকাশ্য বিপ্লবে এবং ...বুর্জোয়াদের সবল উচ্ছেদসাধনে প্রোলেতারিয়েত শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়।"

ইশতেহারে এইভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণিকে দেখালেন যে পুঁজিতন্ত্রের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সর্বোপরি শ্রমিক শ্রেণিকে তাঁরা দেখালেন— শ্রমিক শ্রেণির কর্তব্য পুঁজির বিরোধিতা ও বুর্জোয়াদের উচ্ছেদকল্পে বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি। তাঁরা বর্ণনা করলেন— শ্রমিক শ্রেণিকে তার শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট সমাজের স্রষ্টা হিসেবে তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোন পথ অনুসরণ ও কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

মার্কস ও এঙ্গেলস দেখালেন, শ্রমিকশ্রেণির দ্বারা সঙ্ঘটিত বিপ্লবের "প্রথম পদক্ষেপটি হবে শাসক শ্রেণির অবস্থানে প্রোলেতারিয়েতকে তুলে আনা," তার মানে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা "শাসকশ্রেণির অবস্থানে প্রোলেতারিয়েতকে তুলে আনার"-র প্রকৃত গণতান্ত্রিক চরিত্রের ওপর জোর দিয়ে বললেন যে এ হচ্ছে, "গণতন্ত্রের যুদ্ধ" জয়, ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু শোষকদের ওপর শ্রমজীবী জনসাধারণের শাসন কায়েম। যে-বিষয়ে পরবর্তীকালে লেনিন লিখেছেন, এমনিভাবে মার্কস ও এঙ্গেলস রূপায়িত করেছেন— "রাষ্ট্র সম্পর্কে

ছয়ের পাতায় দেখুন

কমিউনিস্ট ইশতেহার রচনার পথে মার্কস-এঙ্গেলস

পাঁচের পাতার পর

মার্কসবাদের সবেচেয়ে লক্ষণীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা, অর্থাৎ 'প্রোলেতারিয়েতের একনায়কত্বের' ধারণা"।

কিন্তু শ্রমিক শ্রেণি কোন লক্ষ্য সাধনের জন্যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা ব্যবহার করবে? ইশতেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস জোরের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, "প্রোলেতারিয়েত তার রাজনৈতিক আধিপত্য ব্যবহার করবে বুর্জোয়াদের হাত থেকে ধাপে ধাপে সকল পুঁজি ছিনিয়ে নিতে, রাষ্ট্রের হাতে— অর্থাৎ শাসকশ্রেণি হিসেবে সংগঠিত প্রোলেতারিয়েতের হাতে— উৎপাদনের সকল হাতিয়ার কেন্দ্রীভূত করতে, সমগ্র উৎপাদন-শক্তি যতটা সম্ভব দ্রুত বাড়িয়ে তুলতে।" সর্বোপরি শ্রমিকদের সামনে তাঁরা তুলে ধরলেন রাষ্ট্র-ক্ষমতাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যবহার করার ও আপন রাষ্ট্রের ব্যবস্থাবলিকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করার প্রয়োজনীয়তা। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলির ওপরে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়াটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেন না প্রোলেতারীয় রাষ্ট্রের সংহতি চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে এই ব্যবস্থাবলির ওপরেই। লভ্য সকল উপায়ে উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে হবে জমিতে ও শিল্পে। সেজন্যে চাই কর্ম "সাধারণ একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী।"

সঙ্গে সঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণিকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন, অর্থনৈতিক রূপান্তরণের পরে অবশ্যই হওয়া চাই সমাজের সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। প্রোলেতারিয়েতকে অবশ্যই লোপ করতে হবে শাসক শ্রেণির শিক্ষাগত সুযোগসুবিধা, অবশ্যই যোগ স্থাপন করতে হবে শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনের। দুই বন্ধু লিখলেন, "কমিউনিস্ট বিপ্লব হল চিরাচরিত সম্পত্তি-সম্পর্কের সঙ্গে একেবারে আমূল বিচ্ছেদ; এই বিপ্লবের বিকাশে চিরাচরিত ধারণার সঙ্গেও যে একেবারে আমূল একটি বিচ্ছেদ নিহিত, তাতে আর আশ্চর্য কী।"

এমনিভাবে কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার শ্রমিক শ্রেণির সামনে রেখেছে সমাজের বৈষয়িক ও বৌদ্ধিক জীবনের পরিবর্তন সাধন করার ও সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার মহান লক্ষ্য। মার্কস ও এঙ্গেলস ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, 'শ্রেণি ও শ্রেণিবিরোধ সংবলিত পুরনো বুর্জোয়া সমাজের স্থান নেবে এক সমিতি যার মধ্যে প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীন বিকাশ হবে সকলের স্বাধীন বিকাশের শর্তে। সমাজতন্ত্র মানুষের সামনে মেলে ধরে এক নতুন যুগ, এমন এক যুগ যেখানে মানুষ এই প্রথম হয়ে ওঠে প্রকৃত অর্থেই মানবিক।

শ্রমিক শ্রেণি ও শ্রমজীবী জনগণের শাসনের সুরে বাঁধা এই যুগের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস বললেন যে, এ হচ্ছে জনগোষ্ঠী ও জাতিসমূহের বিকাশে এক নতুন কাল। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার পরে প্রোলেতারিয়েত অগ্রসর হয়ে আসে "জাতীয় শ্রেণির" অবস্থানে। প্রোলেতারিয়েত গ্রহণ করে জাতির নেতৃত্ব, জাতির সামনে মেলে ধরে সম্পূর্ণ নতুন ও আশাবাদী পরিপ্রেক্ষিত। "যে পরিমাণে জাতির মধ্যে শ্রেণি-বিরোধ শেষ হবে, সেই অনুপাতে এক জাতির প্রতি অন্য জাতির শত্রুতাও মিলিয়ে যাবে।" অতীত ও বর্তমানের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে মার্কস ও এঙ্গেলস ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, সমাজতান্ত্রিক জগতে কখনই জাতিতে জাতিতে রক্তাক্ত যুদ্ধ হবে না, যেমনটি ঘটিয়ে থাকে পুঁজিতন্ত্র। শ্রমিকশ্রেণি মানবজাতিকে দেবে চিরস্থায়ী শান্তি। অর্থাৎ কমিউনিস্টরা প্রমাণ দেয় যে তারাই খাঁটি দেশপ্রেমিক, আপন জনগণের খাঁটি সন্তান।

ইশতেহারে মার্কস ও এঙ্গেলস গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরলেন সেই মূলনীতি যা তাঁরা ইতিমধ্যেই বাস্তবে কার্যকর করেছেন; যদি শ্রমিক শ্রেণিকে ইতিহাস ও জাতির প্রতি তার দায়িত্বের সমতুল হতে হয়, শ্রমিক শ্রেণির চাই মতাদর্শের দিক থেকে আলোকপ্রাপ্ত, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত একটি পার্টি। শ্রমিক শ্রেণিরই অংশ এই পার্টি, কেন না কমিউনিস্টদের "সমগ্রভাবে প্রোলেতারিয়েতের স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনও স্বার্থ নেই।" কিন্তু পার্টি অবশ্যই তার অন্তর্ভুক্ত সমাবেশে ঐক্যবদ্ধ করবে শ্রমিক শ্রেণির সেরা উপাদান ও গুণাবলি। পার্টি হচ্ছে প্রোলেতারীয় জনতার সংগঠিত ও সচেতন অগ্রবাহিনী। পার্টি থাকে সংগ্রামের পুরোভাগে। পার্টি শ্রেণিকে নেতৃত্ব দেয়। শ্রমিকদের বিপ্লবী পার্টি এ-কাজটি করতে পারে কেন না এই পার্টির আছে "শ্রমিক শ্রেণির অধিকাংশের তুলনায় এই সুবিধা যে শ্রমিক আন্দোলনের এগিয়ে যাওয়ার পথ, শর্ত এবং শেষ সাধারণ ফলাফল সম্বন্ধে তার স্বচ্ছ বোধ রয়েছে।"

প্রোলেতারিয়েতকে সাফল্যের সঙ্গে চালনা করা যদি শ্রমিক শ্রেণির পার্টির অভিপ্রেত হয় তা হলে পার্টি কদাচ সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে না, পার্টি থাকবে জনগণের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত, পার্টির ভিত্তি হবে জনগণ, পার্টি শিক্ষা নেবে জনগণের অভিজ্ঞতা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে পার্টিকে অবশ্যই লড়াই চালাতে হবে বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে, শ্রমিক শ্রেণির ওপরে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রভাবের বিরুদ্ধে। এ-কারণে ইশতেহারে প্রজ্ঞা ও শ্লেষের সঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের বুর্জোয়া মতাদর্শ এবং কালানুপযোগী ও অবৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট 'তত্ত্ব' ও 'ব্যবস্থার' সমালোচনা করা হয়েছে।

ইশতেহারের সৃষ্টিকর্তারা আরও দেখালেন, একই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতএব একই স্বার্থ ও লক্ষ্যের অংশভাগী হয়ে, সকল দেশের শ্রমিকরা অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন অনুভব করে সাধারণ কর্মের ও সংহতির। ইশতেহারে তাই জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে যে কমিউনিস্টরা "বিভিন্ন দেশের প্রোলেতারিয়েতের জাতীয় সংগ্রামে ... জাতি-নির্বিশেষে সারা প্রোলেতারিয়েতের সাধারণ স্বার্থের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকেই সামনে টেনে আনে"। প্রোলেতারীয় আন্দোলনের ঐক্য রক্ষা করা এবং একটি একক দেশের প্রোলেতারিয়েতের কর্তব্যের সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সাধারণ লক্ষ্যকে একীভূত করার প্রয়োজনের ওপর মার্কস ও এঙ্গেলস বিশেষ জোর দিলেন। এ-কারণেই কমিউনিস্টরা লড়াই করে থাকে "আশু লক্ষ্য পূরণের জন্য, শ্রমিক শ্রেণির সাময়িক স্বার্থ বলবৎ করার জন্য; কিন্তু বর্তমানের আন্দোলনের মধ্যেও তারা সেই আন্দোলনের ভবিষ্যতের প্রতিনিধি, তার রক্ষক।"

পরিশেষে, জার্মানিতে যে-সব বৈপ্লবিক সমস্যার সমাধান করতে হবে তা নিয়ে ইশতেহারে আলোচনা তুললেন মার্কস ও এঙ্গেলস। বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে কমিউনিস্টদের কর্তব্য হচ্ছে, "বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিটি বিপ্লবী আন্দোলন সমর্থন করা।"

তাঁরা লিখলেন, "জার্মানিতে বুর্জোয়ারা যখন বিপ্লবী অভিযান করে তখনই কমিউনিস্টরা তাদের সঙ্গে একত্রে লড়ে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র, সামন্ত জমিদারতন্ত্র ও পেটিবুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে। কিন্তু বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়েতের মধ্যে যে বৈরি বিরোধিতা বর্তমান তার যথাসম্ভব স্পষ্ট স্বীকৃতি শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সঞ্চার করার কাজ থেকে তারা মুহূর্তের জন্যও বিরত হয় না...যাতে, জার্মানিতে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণিগুলির পতনের পর যেন বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধেই অবিলম্বে লড়াই শুরু হতে পারে।"

আসন্ন বৈপ্লবিক সংগ্রামে জার্মান শ্রমিক শ্রেণিকে নির্দেশক লাইন দিলেন মার্কস ও এঙ্গেলস

জার্মান বিপ্লবকে তাঁরা সবসময়েই দেখেছিলেন ইউরোপের সামগ্রিক বৈপ্লবিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে। সে-সময়ে তাঁরা আশা করতেন, প্রোলেতারীয় চরিত্রবিশিষ্ট বিপ্লব শুরু হয়ে যাবে ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সের বৈপ্লবিক তরঙ্গ শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত করবে শ্রমিক শ্রেণি ও মধ্য শ্রেণির শাসন। এই অবস্থায় তাঁরা আশা করতেন যে জার্মানির বুর্জোয়া বিপ্লব হবে "অব্যবহিত পরবর্তী প্রোলেতারীয় বিপ্লবের ভূমিকা মাত্র।" পরবর্তীকালে বোঝা গিয়েছে এই মত সময়ের আগেই গঠন করা হয়েছিল, কেন না ১৮৪৮ সালে অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর— পরবর্তীকালে এঙ্গেলস যে-কথা লিখেছেন—এমনকী ইউরোপের সবচেয়ে অগ্রসর দেশগুলিতেও "তখনও পর্যন্ত যথেষ্ট মাত্রায় পরিপক্ক নয়" যাতে "পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিলোপ ঘটানো যায়"। তবুও আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ রণনীতির ক্ষেত্রে মার্কস ও এঙ্গেলসের এই সমস্ত তত্ত্বগত চিন্তার স্থায়ী মূল্য রয়েছে।

চিত্তগ্রাহী ও সাড়া-জাগানো এই ইশতেহারের প্রতিটি লাইন খোলাখুলি শ্রমিক শ্রেণির সপক্ষে ও বিপ্লবী আবেগে উজ্জীবিত। সংগ্রামের এই কর্মসূচির শেষ কয়েকটি বাক্য বৈজয়ন্তী ডঙ্কার মতো ঃ 'কমিউনিস্ট বিপ্লবের আতঙ্কে শাসক শ্রেণিরা কাঁপুক। শৃঙ্খল ছাড়া প্রোলেতারিয়েতের হারাবার কিছু নেই। জয় করবার জন্যে আছে সারা জগৎ। সকল দেশের শ্রমজীবী মানুষ এক হও!"

'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার' ছিল বৈজ্ঞানিক কমিউনিজমের জন্মপত্রিকা। ইশতেহারের স্রষ্টারা ছিলেন জার্মান জনগণের সন্তান।

দর্শন, অর্থনীতি-বিজ্ঞান, ইতিহাসতত্ত্ব, সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ জানার বিষয়গুলি মার্কস ও এঙ্গেলস আয়ত্ত করেছিলেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রসর ধারণাগুলিকে তাঁরা বিশ্লেষণ করেছিলেন ইতিহাস ও সমকালীন সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে। একই সঙ্গে তাঁরা অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলেন জার্মান জনগণের শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক ঐতিহ্য। আবিষ্কারের এই সম্মুখগামী প্রক্রিয়ায় তাঁরা যে অভিমত গড়ে তুলেছিলেন তার মধ্যে সেই প্রথম জ্ঞানের বিভিন্নতম শাখায় একটি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের মধ্য দিয়ে তাঁরা বৈপ্লবিক তত্ত্বকে উন্নীত করেছিলেন সম্পূর্ণ একটি নতুন স্তরে। বিশ্ব-পরিবর্তনকারী এই সমস্ত মতামতেরই ধ্রুপদী প্রকাশ ঘটেছে 'কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার'-এ। (সমাপ্ত)

জেলায় জেলায় নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে কনভেনশন

ক্যানিং ঃ নারী নিগ্রহের বিরুদ্ধে ৩০ মার্চ ক্যানিং ১ নম্বর ব্লকের গোপালপুর অঞ্চলে আমতলা মাস্টার পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয় একটি নাগরিক কনভেনশন। আশেপাশের গ্রামগুলি থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় ছয়শত মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এখানেই ১৯ মার্চ মধ্যরাত্রে এক গৃহবধূর সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মানুষ রাস্তায় নেমে এসে প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। ২০ মার্চ ভোর থেকে সহস্রাধিক মানুষ ঢোসা-ক্যানিং রোড অবরোধ করে অবিলম্বে দুষ্কৃতীর গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি করেন। জনগণের চাপে পুলিশ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে পাঁচশত মহিলার এক বিরাট মিছিল এলাকা পরিক্রমা করে। স্বভাবতই এই নাগরিক কনভেনশনের সঙ্গে যুক্ত ছিল এলাকার মানুষের ভাবাবেগ ও প্রতিবাদমনস্কতা।

বক্তব্য রাখেন রাজ্যস্তরে সদ্য গঠিত নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য স্বপন চক্রবর্তী ও শম্পা সরকার। বক্তব্য রাখেন শিক্ষক সঞ্জীব হালদার ও হারাধন মিস্ত্রী এবং এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক সাহাবুদ্দিন নস্কর। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এলাকার সুপরিচিত সমাজকর্মী সফি পৈলান। সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক নাজমত তৌহিদ আখন্দ। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন রামপ্রসাদ মিস্ত্রী। সভা থেকে হাসিবুর আসার আখন্দকে সভাপতি এবং রোশনারা আখন্দ ও হারানচন্দ্র মিস্ত্রীকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩০ জনের নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

বিষ্ণুপুর ঃ ৫ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কে এম স্কুলে (টাউন স্কুল)-এ কনভেনশনে শতাধিক নাগরিক অংশগ্রহণ করেন। প্রবীণ অধ্যাপক কালিকিঙ্কর জানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে আইনজীবী মহাদেব দে, শিক্ষক কমলাকান্ত কর্মকার, বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রবিদুলাল ঘোষ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। মুখ্য আলোচক ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব নদীয়া ইন্দু বিশ্বাস। এই কনভেনশন থেকে ৩৩ জনের নারী নিগ্রহ প্রতিরোধ কমিটি গঠিত হয়। প্রবীণ শিক্ষক কমলাকান্ত কর্মকার সভাপতি, আইনজীবী মহাদেব দে সম্পাদক এবং টুম্পা গোস্বামী সহ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

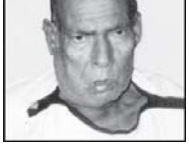

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর ২ নং ব্লকের অন্তর্গত বাইশহাটা অঞ্চলের প্রবীণ সংগঠক কমরেড দাউদ আলি মোল্লা দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ৮২ বছর বয়সে গত ৫ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। '৫০-এর দশকে ঐ জেলায় যে ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড আমির আলি হালদার — যিনি পরবর্তীকালে দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও কৃষক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকের দায়িত্ব পান — তাঁর মাধ্যমেই পার্টির বিপ্লবী রাজনীতির সাথে কমরেড দাউদ মোল্লার পরিচয় ঘটে। এই প্রক্রিয়াই তাঁর মধ্যে বিপ্লবী তত্ত্বচর্চার আগ্রহ গড়ে তোলে। তেভাগা আন্দোলনের সৈনিক হওয়ায় জমিদার-জোতদারপুষ্ট লেঠেল বাহিনীর নিদারুণ অত্যাচার হয়েছে তাঁর উপর। বহুবার তাঁকে হত্যার চেষ্টাও হয়েছে। তিনি নির্ভীকভাবে এ সবের মোকাবিলা করেছেন।

প্রয়াত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ১ এপ্রিল বাইশহাটা লোকাল হাট সংলগ্ন মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় স্মৃতিচারণ করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তপন রায়চৌধুরী এবং জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত কমরেডের দীর্ঘদিনের সাথী কমরেড আবদুল ওহাব হালদার।

কমরেড দাউদ আলি মোল্লা লাল সেলাম

লক আউটে শ্রম দিবস নষ্ট ৫৬ হাজার

একের পাতার পর

আসলে কারখানা বন্ধ হয় মালিকদের লক আউটের কারণেই, শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে নয়।

অথচ এই সত্যটিকেই মালিকরা গোপন করতে চায় যাতে জনসাধারণের মনে বনধ-ধর্মঘট সম্পর্কে একটা বিরূপ মনোভাব গড়ে ওঠে। এর জন্য পুঁজিপতিদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যম হিসেব দিতে থাকে কত শ্রমিক, কত গরিব, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষ বনধ-ধর্মঘটে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সেই শোকে চোখের জলে ভাসতে থাকে। কিন্তু এইসব সংবাদমাধ্যম, তাদের লেখক অর্থনীতি-সমাজবিজ্ঞানের পণ্ডিতরা কখনও লেখে না, কেন শ্রমিকরা ধর্মঘটে যেতেবাধ্য হয়। মালিকরা যুগ যুগ ধরে শ্রমিকদের শোষণ করে আসছে, ঠকিয়ে আসছে। শ্রমিকদের শোষণ করেই মালিকদের মুনাফার পাহাড় আরও উঁচু হয়ে চলেছে। আর উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও অধিকাংশ মানুষ দু'বেলা পেটভরা খাবারটুকুও জোগাড় করতে পারছে না। অশেষ প্রবঞ্চিত বুভুক্ষু শ্রমিক যখন সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছায় তখনই বাধ্য হয়ে তারা ধর্মঘট করে। না হলে শখ করে তারা ধর্মঘটে যায় না। অথচ এ সব প্রসঙ্গ এই পণ্ডিতরা তাদের প্রচারে, লেখায় সচেতনভাবে এড়িয়ে চলে।

বনধ-ধর্মঘটের বিরুদ্ধে মালিকদের এই আক্রোশের কারণ কী? ধর্মঘট মালিকদের একেবারে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় শ্রমিকদের। সরাসরি আঘাত হানে মালিকের প্রতিদিনকার মুনাফায়। পাশাপাশি ধর্মঘট মেহনতি মানুষকে বুঝতে শেখায় মালিকদের শক্তির উৎস কী, শোষিত মানুষের শক্তির উৎসই বা কোথায়। ধর্মঘটে শ্রমিক যখন কাজ করতে

> মালিকদের এই অন্যায় জুলুম, শোষণ, প্রতারণা যতদিন থাকবে, মালিকরা শত চেষ্টা করেও শোষিত মানুষকে ধর্মঘট থেকে, আন্দোলন থেকে বিরত করতে পারবে না। শোষণ, জুলুম থাকলে শোষিত মানুষ ধর্মঘট-আন্দোলনে নামবেই। কারণ, মজুরিবৃদ্ধি না হলে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ না হলে তারা বাঁচতে পারে না।

অস্বীকার করে, বাকি সমস্ত উৎপাদন যন্ত্রই অকেজো হয়ে পড়ে। ধর্মঘট শ্রমিকদের নিজেদের শক্তি সম্পর্কে সচেতন করে, বুঝতে শেখায়— মালিক যতই অর্থ, সম্পদ, উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হোক না কেন, শ্রমিকদের শ্রম ছাড়া সে-সবই মূল্যহীন, তা থেকে কোনও মুনাফাই আসবে না। সমস্ত ধর্মঘট মালিক শ্রেণিকে মনে করিয়ে দেয়, শ্রমিকই হল সত্যিকারের মালিক— তারা নয়। আবার, ধর্মঘট প্রতিটি শ্রমিককে মনে করিয়ে দেয়, তারা একা নয়, কাজেই হতাশার কিছু নেই। এই কারণেই মালিকরা ধর্মঘটকে ভয় পায় এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা বন্ধ করতে চায়।

মালিকি শোষণের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা মিছিল, মিটিং, সমাবেশের মতো আন্দোলনের পদ্ধতিগুলিকে মালিকরা উপেক্ষা করতে পারে। আন্দোলনকারীদের সাথে কারখানার মালিক বা সরকারের মন্ত্রী-আমলারা দেখা না করতে পারেন, দাবি পূরণের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন, দেখছি-দেখব করে কালহরণ করতে পারেন। কিন্তু ধর্মঘটকে তাঁরা এভাবে উড়িয়ে দিতে পারেন না। কারণ, একটা মিছিল বা সমাবেশ যত বড়ই হোক, তাতে সামিল হয় ঐ দাবির সঙ্গে যুক্ত মোট জনসংখ্যার একাংশ। একমাত্র ধর্মঘটই সংশ্লিষ্ট সকল অংশের মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত করে নিতে পারে। তাই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে মালিকরা, মন্ত্রীরা, তাদের পরিচালিত সংবাদমাধ্যম এত খড়্গহস্ত।

প্রচারমাধ্যমগুলির পিছনে কাজ করে মালিকদেরই বিপুল পরিমাণ পুঁজি। এগুলির মালিক তারাই। স্বাভাবিকভাবেই বনধ-ধর্মঘট সম্পর্কিত প্রচারে তাদের কাছ থেকে নিরপেক্ষতা আশা করা যায় না। বনধ-ধর্মঘটের বিরুদ্ধে তারা এক তরফা মনগড়া এবং বিকৃত প্রচার করতে থাকে। এভাবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। আবার সিপিএম কংগ্রেস তৃণমূলের মতো শাসকদলগুলিও একদিকে গরিব মানুষের স্বার্থরক্ষার কথা বলে, অপরদিকে মালিকদের স্বার্থে বনধ-ধর্মঘটের বিরোধিতা করে। বিশেষ করে যে দল যখন ক্ষমতায় থাকে তারা তখন হয়ে ওঠে বনধ-ধর্মঘটের মস্তবড় বিরোধী। তারা পুলিশ নামিয়ে, সশস্ত্র বাহিনী নামিয়ে ধর্মঘটকে ভাঙে, ধর্মঘটকারীদের হুমকি দেয়, গ্রেপ্তার করে, জেলে পোরে। অতীতে সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলতেন, ধর্মঘট বরদাস্ত করব না। এমনকী তাঁর দল লোক-দেখানো ধর্মঘটের যতটুকু খেলা দেখাত, সেটাও তিনি দুর্ভাগ্য বলেই গণ্য করতেন। গত ২০-২১ ফেব্রুয়ারির ভারত বনধে সিপিএমের ভূমিকা চরম ন্যক্কারজনক। একদিকে নিজেদের গরিববদরদি প্রমাণ করতে তাঁরা ধর্মঘটের ডাকে সামিল হয়েছেন, আবার মালিকদের সন্তুষ্ট করে এ রাজ্যে ক্ষমতায় ফিরে আসার আশায় দু'দিনের ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছেন। ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও বলছেন, ধর্মঘট চলবে না। তিনি যা বলেন তাঁর পারিষদরা যে তার শতগুণ বলবেন সে তো জানা কথা। তাই একদা জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বর্তমান শ্রমমন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসু মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে গর্বের সঙ্গে বলেছেন, ধর্মঘটের সংখ্যা কমেছে, শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মসংস্কৃতি ফিরে এসেছে। তিনি বিধানসভায় রীতিমতো হুমকি দিয়েছেন, ধর্মঘট নিষিদ্ধ করতে তিনি বদ্ধপরিকর। তাই আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দলীয় কর্মী এবং পুলিশ লেলিয়ে, কর্মচারীদের মাইনে কেটে, চাকরিতে ছেদ ঘটিয়ে তিনি সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছেন।

পূর্বতন সরকার বা বর্তমান সরকারের মন্ত্রীদের এই বক্তব্যে পরিষ্কার যে, পতাকার রং তাঁদের যা-ই হোক, তাঁরা সকলেই আসলে মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করে চলেন। না হলে শ্রমমন্ত্রী বিধানসভায় লক আউটের যে তথ্য দিয়েছেন তারপর তাঁকে ঐ সমস্ত মালিকদের গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে হত। কারণ এই সব লক আউটই বেআইনি। আর যে সংবাদমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী বা অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা একদিন বনধ বা ধর্মঘট হলে ধর্মঘটকারীদের বিরুদ্ধে রে রে করে ওঠেন, এমন একটি ভয়ঙ্কর তথ্য পাওয়ার পরেও তাঁদের কিন্তু মালিকদের বিরুদ্ধে রে রে করে উঠতে দেখা গেল না, তাদের শাস্তি দাবি করতে দেখা গেল না, তেমনই বন্ধ কারখানাগুলির না খেতে পাওয়া শ্রমিকদের জন্য এক বিন্দু চোখের জল ফেলতেও দেখা গেল না। শুধু তাই নয়, মহা বনধবিরোধী বলে পরিচয় দেওয়া প্রথম সারির এক দৈনিকে দেখা গেল, তাদের প্রচারিত সংবাদে মন্ত্রীর দেওয়া এই তথ্যের উল্লেখই নেই। বাস্তবিক এই তথ্য একই সাথে সরকার, মন্ত্রী, সংবাদমাধ্যম, ভাড়াটে অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ— সকলেরই মুখোশ খুলে দিয়েছে।

মালিকদের এই অন্যায় জুলুম, শোষণ, প্রতারণা যতদিন থাকবে, মালিকরা শত চেষ্টা করেও শোষিত মানুষকে ধর্মঘট থেকে, আন্দোলন থেকে বিরত করতে পারবে না। শোষণ, জুলুম থাকলে শোষিত মানুষ ধর্মঘট-আন্দোলনে নামবেই। কারণ, মজুরিবৃদ্ধি না হলে, মূল্যবৃদ্ধি রোধ না হলে তারা বাঁচতে পারে না। এই সব দাবিতে আন্দোলন ছাড়া, ধর্মঘট ছাড়া মালিকরা বা সরকার কান দেয় না। তাই আন্দোলনে, ধর্মঘটে তাদের যেতেই হয়। এক সময় যাদের উন্নত দুনিয়া বলা হত, সেই আমেরিকা, ইউরোপের শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে, মিছিল করছে, রাস্তা অবরোধ করছে, এ কথা কেউ ভাবতে পারতনা। কিন্তু পুঁজিপতিদের চরম শোষণের ফলে সেখানেও অর্থনীতিতে মন্দা ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। ফলে লাখে লাখে শ্রমিক প্রতিদিন রাস্তায় নামছে, ধর্মঘটে দিনের পর দিন অচল হয়ে পড়ছে ইউরোপ-আমেরিকার শহরগুলি। এ দেশেও একই চিত্র। মালিকি শোষণে অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে ভয়ঙ্কর মন্দা। শোষিত মানুষ কোনও বিরুদ্ধ প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে একের পর এক দেশজোড়া ধর্মঘট সফল করে তুলছে। সর্বশেষ ২০-২১ ফেব্রুয়ারির ধর্মঘটে দেশের শোষিত মানুষের যে সমর্থন লক্ষ করা গেছে তাতেই কাঁপন ধরে গেছে মালিকদের বুকে। আন্দোলনের নেতৃত্ব থেকে যদি মালিক শ্রেণির এই সমস্ত এজেন্টদের বিচ্ছিন্ন করা যেত এবং শ্রমিক শ্রেণির যথার্থ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হত তবে এই ধর্মঘট যথার্থই তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেত।

কমসোমলের উদ্যোগে কিশোর শিবির ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

কিশোর-কিশোরীদের উন্নত সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সন্ধান দিতে কিশোর সংগঠন কমসোমল যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারই অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ২৯ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বল্লুক স্কুল মাঠে তারা আয়োজন করেছিল একটি কিশোর শিবিরের। শিবিরে জেলার প্রায় শতাধিক কিশোর-কিশোরী নানা ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়, উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি)-র পূর্ব মেদিনীপর জেলা সম্পাদক কমরেড দিলীপ মাইতি।

এই সমাজে কিশোর-কিশোরীরা শিখছে অন্যকে দাবিয়ে ইঁদুর দৌড়ে প্রথম না হলে জীবন ব্যর্থ। এর বিপরীতে সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে কমসোমল। কমরেড শিবদাস ঘোষের হাতে গড়া এই সংগঠন কিশোর বয়স থেকেই দিতে চায় সকলকে বড় করার চেষ্টার মাধ্যমেই নিজে বড় হওয়ার এক নতুন ধরনের প্রতিযোগিতার সন্ধান। শিবিরে নানা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির এই সুরটিই উপস্থিত সকলকে ধরানোর চেষ্টা করেন নেতৃবৃন্দ। দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, নানা-ধরনের খেলা, ব্যায়াম ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এই উদ্দেশ্যেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে গল্প বলা প্রতিযোগিতাতেও কিশোর-কিশোরীরা অংশ নেয়। সকল প্রতিযোগীরা পুরস্কৃত হয়।

শিবিরে আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (সি) দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অনুরূপা দাস এবং কমসোমলের রাজ্য ইনচার্জ কমরেড অরুণ জানা।

নির্মাণ কর্মী ইউনিয়নের পশ্চিম মেদিনীপুর সম্মেলন

ভবিষ্যনিধি প্রকল্পে ঘোষিত টাকার পরিমাণ বাড়ানো সহ নানা দাবিতে সারা বাংলা নির্মাণ কর্মী ইউনিয়ন-এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৯ মার্চ বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে। সহস্রাধিক নির্মাণ কর্মী উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শান্তি ঘোষ। কমরেড নারায়ণ অধিকারীকে সভাপতি ও কমরেড পূর্ণ বেরাকে সম্পাদক করে ৩৯ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়েছে।

পাশ-ফেল ফেরানোর ইঙ্গিত মন্ত্রীর বক্তব্যকে স্বাগত সেভ এডুকেশন কমিটির

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অব এডুকেশন বা ক্যাবের বৈঠকে 'পাশ-ফেল' প্রথা পুনরায় ফিরিয়ে আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী এম এম পল্লম রাজু। ৩ এপ্রিল এক বিবৃতিতে এই বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্ত্তিক সাহা। তিনি বলেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত 'পাশ-ফেল' প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে শিক্ষার মান শুধু নেমে গেছে তাই নয়, শিক্ষার প্রতি আকর্ষণও হারিয়ে যাচ্ছে। এমনকী স্কুল ছুটও বাড়ছে।

তিনি বলেন, আমরা শুরু থেকেই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাচ্ছি। আমাদের দাবি, অবিলম্বে 'পাশ-ফেল' প্রথা পুনরায় ফিরিয়ে আনার ঘোষণা করুক সরকার। সাথে সাথে প্রাথমিক স্তরেও 'পাশ-ফেল' প্রথা চালু করা হোক।

বোটানিক্যাল গার্ডেনে প্রাতঃভ্রমণকারীদের দাবি আদায়

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে সিনিয়র সিটিজেনদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রাতঃভ্রমণের অধিকার ও ভ্রমণের জন্য বছরের যে কোনও সময়ে এন্ট্রি পাস করানোর অধিকার কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে বাধ্য হল। ইতিপূর্বে এক নোটিশে গার্ডেন কর্তৃপক্ষ প্রাতঃভ্রমণকারীদের বাৎসরিক ২০০ টাকা দিয়ে এন্ট্রিপাস নেওয়া বাধ্যতামূলক করেছিল। প্রতিবাদে 'বি গার্ডেন ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন' স্বাক্ষর সংগ্রহ, পদযাত্রা, ধরনা, ডেপুটেশনের কর্মসূচি নেয়। এক নাগরিক কনভেনশনে স্থানীয় সাংসদ, বিধায়ক, বেসুর উপাচার্য ডঃ অজয় রায়, স্থানীয় বাসিন্দা জয়নগরের এম পি তরুণ মণ্ডল, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী প্রমুখ সামিল হন। পাশাপাশি অ্যাসোসিয়েশন হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টেও আইনি লড়াই শুরু করে। এরই পরিণতিতে হাইকোর্ট ১ মার্চ গার্ডেন কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে উপরোক্ত দাবিগুলি মেনে নেওয়ার নির্দেশ দেয়। তারপরও কর্তৃপক্ষ নানা টালবাহানা চালাতে থাকে। পুনরায় আবেদন জানালে হাইকোর্ট গার্ডেনের যুগ্ম অধিকর্তার আইনজীবীকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে রায় কার্যকর করার আদেশ দেন।

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তাপস দাস জানান, এই রায়ে হাজার হাজার প্রাতঃভ্রমণকারীর মধ্যে প্রবল উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্যান্য দাবি নিয়েও তাঁরা আন্দোলন গড়ে তুলবেন।

R.N.I. No 5268 / 60
P.R. No. KOL RMS / 138 / 2013-2015

কলকাতা, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলি জেলার নেতা-কর্মীদের এক রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির ২৯-৩১ মার্চ উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

আন্দোলন করার 'অপরাধে' মেদিনীপুরে ১৭ জন ছাত্র গ্রেপ্তার

একের পাতার পর

করে। সংগঠনের ব্যানার ফেস্টুন কেড়ে নেয়, প্রচার মাইক সহ রিক্সাচালককেও গ্রেপ্তার করে।

সিপিএম আমলে পুলিশ যেভাবে গণআন্দোলনের কর্মীদের উপর নৃশংস আক্রমণ করত, সেই ধারাই বহন করছে তৃণমূল সরকারের পুলিশ। এই পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ২ এপ্রিল মেদিনীপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। ৩ এপ্রিল রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

কমরেড ভীম মণ্ডল বলেন, ৩১ মার্চ পরীক্ষার দিন কাঁসাই ব্রিজে ট্রাকের টায়ার পাংচারজনিত উদ্ভট কারণে সারাদিন যান চলাচল স্তব্ধ রইল। অসংখ্য পরীক্ষার্থী পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতেই পারলেন না। যে পুলিশ ডি এস ও-ডি ওয়াই ও কর্মীদের উপর পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল, তারাই সেদিন ছিল নির্বিকার। তিনি বলেন, যাঁরা পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারেননি তাদের পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে সেদিন জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিতে গেলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। কমরেড মণ্ডল দোষী পুলিশদের শাস্তি ও ডি এস ও কর্মীদের উপর থেকে সমস্ত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বলেন, পরীক্ষার দিন এই ডামাডোল সৃষ্টির পিছনে কোনও চক্রান্ত আছে কিনা প্রশাসনকে তাও তদন্ত করে দেখতে হবে।

রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ডি এস ও রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দীপক পাত্র

চিনি বিনিয়ন্ত্রণের নিন্দা করল এস ইউ সি আই (সি)

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৫ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, চিনির দাম এবং কী পরিমাণে তা খোলা বাজারে আসবে ও লেভির মাধ্যমে কতটা রেশন দোকানে সরবরাহের জন্য সরকার সংগ্রহ করবে সে বিষয়ে যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকার। আমরা এর তীব্র নিন্দা করছি। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজির সেবায় নিয়োজিত কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্তের দ্বারা শক্তিশালী চিনি লবিকে তুষ্ট করল, কিন্তু ব্যাপক জনগণকে ঠেলে দিল বিপুল মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে। এরপর মালিক-ব্যবসায়ীরা নানা কায়দায় দাম বাড়াবে, কর বাড়াবে, যার চাপে আরও পিষ্ট হবে জনসাধারণ। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা যেভাবে জনস্বার্থের প্রতি চরম অবজ্ঞা দেখিয়ে মন্তব্য করেছে — 'ভোক্তারা সময়ের সাথে এতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন', তা একই সঙ্গে মন্ত্রীসভা ও তাদের তথাকথিত আর্থিক সংস্কারের জনবিরোধী চরিত্রকে উন্মোচিত করে দিয়েছে।

আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, এভাবে স্বৈরাচারী কায়দায় একের পর এক দানবীয় নীতি সরকার নিতে পারছে শক্তিশালী সংগঠিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অভাবের জন্যই।

তথাকথিত আর্থিক সংস্কারের বিপজ্জনক পরিণামকে উপলব্ধি করার জন্য আমরা ভুক্তভোগী জনগণকে আবেদন জানাচ্ছি এবং একইসঙ্গে সঠিক নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী সচেতন যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি, যে পথেই একমাত্র সরকারি আক্রমণকে প্রতিহত করা সম্ভব।

কেন্দ্রীয় অফিস পুনর্নির্মাণ তহবিলে সাহায্য করুন

জনগণের ন্যায্য দাবি নিয়ে সর্বদা প্রতিবাদ ও আন্দোলনে নিয়োজিত সংগ্রামী দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পুরানো কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের স্থানে নতুন ভবন নির্মাণ আবশ্যিক হয়ে উঠেছে।

বহু পুরানো এই বাড়িটির অবস্থা ভগ্নপ্রায়। দলের বর্তমান কাজের বিস্তৃত পরিধির বিচারে স্থানও যথেষ্ট কম। এই অবস্থায় দলের সকল স্তরের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের ইচ্ছা যে, এই পুরানো ভগ্নপ্রায় বাড়িটির স্থানে নতুন অফিস ভবন নির্মাণ করা হোক। তাই নতুন অফিস ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি। ইতিপূর্বে দলের কর্মী-সমর্থকদের দেওয়া অর্থ বাড়ি ক্রয় করতেই ব্যয় হয়ে গেছে। নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অর্থ চাই। তাই অফিস ভবন নির্মাণের জন্য কেবল দলের কর্মী-সমর্থক-দরদিরাই নয়, ব্যাপক জনগণের কাছে আমরা অর্থ সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।

আমরা বিশ্বাস করি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের সকল কর্মসূচি সফল করতে জনগণ পূর্বাপর যেভাবে অর্থসাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, এবারও কেন্দ্রীয় অফিস ভবন নির্মাণের জন্যও তারা মুক্ত হস্তে অর্থসাহায্য করবেন। অভিনন্দন সহ

দেবপ্রসাদ সরকার
অফিস সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি

চেক দিতে হবে এই নামে ঃ **Socialist Unity Centre of India (Communist)**

পস্কো ঃ বিক্ষোভ-অবস্থান

ওড়িশার জগৎসিংপুরের ঢিনকিয়া, গোবিন্দপুরে পস্কো কোম্পানির জন্য জোর করে জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে ২৬ মার্চ ভুবনেশ্বর বিধানসভা ভবনের সামনে বিক্ষোভ-অবস্থান

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci-c.in